উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর জীবনী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর জীবনী

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর জীবনী

দ্বিতীয় সংস্করণ। 18 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

[ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক]

[অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া]

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান সাহাবী, ইসলামের তৃতীয় সঠিক নির্দেশিত খলিফা, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এর জীবন থেকে কিছু পাঠ নিয়ে আলোচনা করে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর জীবনী

ইসলাম গ্রহণের আগে মক্কায় জীবন

সত্যিকারের বিনয়

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে। তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, ধনী, কথাবার্তায় মার্জিত এবং অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। সে কখনো অনৈতিক কাজ করেনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 17-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। এটি সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি করা হয় না কারণ এগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং পরিমিতভাবে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে চলা

এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো মূর্তিকে সিজদা করেননি বা পূজা করেননি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 17-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন এবং নিষ্প্রাণ মূর্তির উপাসনায় তাঁর চারপাশের লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি।

একজনের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ একটি প্রধান কারণ কেন লোকেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যেমন বিচার দিবস। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ এবং স্পষ্ট লক্ষণের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং গবাদি পশুর মতো অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা উচিত নয়। এই পদ্ধতিতে আচরণ বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

ইসলামে অন্ধ অনুকরণও অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজায় পাওয়া একটি হাদিস, 4049 নম্বর, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের পরিবার, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে ছাড়িয়ে যায় এবং মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও সত্যই। তার প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্ব স্বীকৃতি . এটি আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে একজন সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে যাকে তারা চিনতে পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই কারণ যে মুসলমানরা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পূর্ণ করবে। এবং এটি সেই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তাদের জীবনের সমস্ত অসুবিধাকে জয় করে। যদি তাদের কাছে এটি না থাকে তবে তারা পুরস্কার অর্জন ছাড়াই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল উভয় জগতেই আরও অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পথ দেখাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল অসুবিধার সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে বা বিপরীতে।

মন্দের চাবিকাঠি

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলাম গ্রহণের আগেও কখনও মদ পান করেননি। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে কীভাবে অ্যালকোহল একজন ব্যক্তির বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেয়। এবং তিনি কখনও এমন কিছু দেখেননি যা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সম্পূর্ণরূপে ফিরে এসেছে। ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, 6/353 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন মুসলমানকে কখনই অ্যালকোহল সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি যেমন এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তারা তাদের শরীরের ক্ষতি করে যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদের পরামর্শ দেয় যে নিয়মিত মদ পান করে এমন কাউকে সালাম না করার জন্য।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদীসে দশটি ভিন্ন কোণ থেকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

এতে অ্যালকোহল নিজেই অন্তর্ভুক্ত, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

দরকারী সময়

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু গান শোনা এবং অনর্থক বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 17-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি কেউ যদি দাবি করে যে, কবিতা বা গান শোনা এবং অনর্থক বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা হালাল, তবুও তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।

অনেক মুসলমান আছে যারা তাদের অনেক সময়, শ্রম এবং সম্পদ এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে যা সৎ কাজ বা পাপ নয়, এগুলো নিরর্থক জিনিস। নিরর্থক জিনিসগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন প্রয়োজনের বাইরে নিজের ঘরকে সুন্দর করা। যদিও, তারা তাদের দাবিতে সঠিক হতে পারে যে তারা পাপ করছে না, একটি সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যথা, সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান উপহার, যা একবার চলে গেলে লাভ করা যায় না। সময় ছাড়া অন্য সব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা যায়। সুতরাং যখন কেউ তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদ যেমন সম্পদকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত জিনিসের অর্থ, নিরর্থক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, তখন তা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়। এটি তখন ঘটবে যখন তারা তাদের সময়কে সদ্ব্যবহার করে এবং সৎকাজ সম্পাদনকারীদের প্রদত্ত পুরষ্কার দেখে। সময় নষ্টকারীরা পাপ এড়িয়ে যেতে পারে

যা তাদের শাস্তি থেকে বাঁচায় কিন্তু তারা অযথা কাজে সময় নষ্ট করার কারণে তারা সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। এবং তারা অবশ্যই তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তারা যে পুরষ্কার অর্জন করতে পারত তা অবশ্যই হারাবে।

উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যত বেশি নিরর্থক জিনিসে লিপ্ত হয় সে তত বেশি বাড়াবাড়ি এবং অপচয়ের মধ্যে পড়ে যা উভয়ই দোষের যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা আশীর্বাদ নষ্ট করে তারা শয়তানের ভাইবোন বলে বিবেচিত হয়। এবং এটি তর্ক করা যেতে পারে যখন কেউ নিরর্থক জিনিসের জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মূল্যবান আশীর্বাদকে নষ্ট করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই.."

জ্ঞানের গুরুত্ব

এমনকি প্রাক-ইসলামী জাহেলিয়াতের সময়েও, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় পাওয়া জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে বংশ, প্রবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইতিহাস। সিরিয়া এবং ইথিওপিয়া ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন মানুষের জীবন, রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 17-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তার মনোভাব স্পষ্টভাবে জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

উপার্জনের গুরুত্ব

জাহেলিয়াতের প্রাক-ইসলামী যুগে এবং ইসলাম গ্রহণের পর, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসার দেখাশোনা করেন এবং একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 17-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে

এবং মহান আল্লাহ্ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

মানুষের ভালোবাসা

মুসলমান হওয়ার আগে, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মহৎ চরিত্র এবং অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার কারণে মক্কার সমস্ত গোত্রের কাছে প্রিয় ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন-নূরাইন , পৃষ্ঠা 17-18- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে।

সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"...আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় জীবন

একজন সত্যবাদী মানুষ

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সহজেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 18-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইসলামের আগমনের পূর্বে সত্যবাদিতা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাই যখন তাকে উপস্থাপন করা হয়েছিল তখন তিনি সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

মহৎ গুণাবলী

ইসলাম গ্রহণের পর, উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তাঁর মহৎ গুণাবলী কেবল বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ ইসলাম তাঁর বিশ্বাস থেকে অনেক উপকৃত হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 19- এ নিম্নলিখিত বর্ণনাটি আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ধৈর্যশীলভাবে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

ইসলামের সৌন্দর্য পাওয়া যায়। অনেক হাদিসে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, ৩৬৮৯ নম্বরে পাওয়া যায় এমন অনেক হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর নম্রতা ও কোমল স্বভাবের কারণে সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্নেহের সাথে চলতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

" সুতরাং আল্লাহর রহমতে, [হে মুহাম্মদ], আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কারণে শান্তি ও তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাদের মেজাজ অনেক সময় তাদের কঠিন হৃদয় গলে যেত এবং এইভাবে তারা গ্রহণ করত এই গুণটি এবং মানবজাতির বাকি পথ দেখানোর জন্য বীকন হয়ে উঠেছে । এ জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4809 নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 103:

"... এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর - যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হয়ে গেলে..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট বার্তা। তাদের অবশ্যই কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার পরিবর্তে একটি কোমল গঠনমূলক মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তাদের উচিত জনগণকে একত্রিত করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে অন্যের উপকার করার চেষ্টা করা সমাজের মধ্যে বিতর্ক। একটি ভাল উদাহরণ এই তাদের সন্তানদের প্রতি একজনের মনোভাব দেখা যায়। যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রতি নম্র স্বভাব দেখিয়েছিলেন তারা দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের চেয়ে তাদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। একটি কঠোর মেজাজ। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাব দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে প্রস্রাব করে । যখন সাহাবায়ে কেরাম রা আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে শাস্তি দিতে চান মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তাদের নিষেধ করলেন এবং মসজিদে থাকার আদব বিদুইনকে আলতো করে ব্যাখ্যা করলেন। এই ঘটনাটি সুনানে ইবনে মাজাহ 529 নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে । এই নরম দৃষ্টিভঙ্গি লোকটিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেও উল্লেখ আছে। যেমন ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করলেও তথাপি মহান আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে । উভয়, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানানো না মৃদু এবং সদয় বক্তৃতা ব্যবহার করে নির্দেশনার দিকে। C hapter 79 An Naziat, আয়াত 24:

"এবং বললেন, "আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 43-44:

“তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিঃসন্দেহে সে সীমালংঘন করেছে। এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

শিশুরা এমনকি পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। সুতরাং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে কীভাবে সঠিক পথ দেখা যাবে না? এ কারণেই মহানবী সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, 6601 নম্বরে পাওয়া যায় যে , আল্লাহ তায়ালা তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক যারা শব্দ ছড়িয়ে ইসলামের ভ্রান্ত আকিদা গ্রহণ করেছে ভদ্র হওয়া আমি দুর্বলতার লক্ষণ । এটা শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় ।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামে সন্তুষ্ট ছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকলেও সে ধনী।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ লাভ করবে না যার ফলে তাদের মনে হবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, তাহলে তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে

যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দানশীল, দয়ালু ও উদার ছিলেন।

কপটতার একটি দিক হল লোভ। তাদের চরম লোভ তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি রাখে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যরা দান করাকে তারা অপছন্দ করে কারণ তাদের লোভ অন্যদের কাছে প্রকাশ পায়। তারা মানুষকে দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখে কারণ তারা সমাজে অন্যকে উদার হিসাবে লেবেল করা অপছন্দ করে। তাই তারা সর্বদা লোকেদের দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যেমন খারাপ কারণে দাতব্য

সংস্থাকে কন আর্টিস্ট হিসাবে লেবেল করা। এই লোকদের উপেক্ষা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন যা সহীহ বুখারির 1 নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। সুতরাং তাদের দান করা সম্পদ গরীবদের কাছে না পৌঁছালেও যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করে। সুপরিচিত দাতব্য তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী তাদের পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 67:

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের। তারা অন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত বন্ধ করে..."

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দুর্বল ও নিপীড়িতদের সাহায্য করতেন।

সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন তাদের থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা সেইভাবে আচরণ করেন যেভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব বা ধার্মিক যা-ই হোক না কেন অন্যের জন্য এ ধরনের কষ্ট লাঘব করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানীয় পান করাবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ তারা অন্যকে সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন তখন তার সফল পরিণতি নিশ্চিত হয়। তাই, মুসলমানদের উচিত নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

একটি সুন্দর বিবাহ

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা রুকাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, যা গৃহীত হয়। এটা বলা হয়েছে যে তারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি যা একজন ব্যক্তির দেখা যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন-নূরাইন , পৃষ্ঠা 20-21-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন পিতা তার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য সর্বোত্তম পুরুষেরই ইচ্ছা পোষণ করেন, তাই, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কন্যাকে উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন, এটি তাঁর মহান গুণের ইঙ্গিত দেয়। একজনকে অবশ্যই এই উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একজন জীবনসঙ্গী বেছে নিতে হবে যদি তারা একটি সফল বিবাহ করতে চায়।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন একজনকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি দেখা উচিত তা হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি।

পরিশেষে, একজন মুসলিম যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন তারা তাদের পত্নীর পাওনা কি অধিকার, তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। জ্ঞান একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

মহৎ চরিত্র

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর কন্যা রুকাইয়াহ ও তাঁর স্বামী উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর কন্যাকে উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ভালো যত্ন নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর সাথে, যেহেতু তিনি সাহাবীদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে কাছের ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর মহৎ চরিত্রে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 21-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে সদয় আচরণ করতে চায় তাকেও অন্যদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে অন্যথায় তারা সফল হবে না কারণ একমাত্র প্রকৃত সফল ব্যক্তিরাই বিশ্বাসী।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের সম্পদকে তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

অবিচলতা

বাকি সাহাবীদের মতই, উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা মৌখিক এবং শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিল। তার চাচা তাকে ধরে শৃঙ্খলিত করে এবং তাকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য হিংসাত্মক হুমকি দেয়। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর অটল ছিলেন এবং তাঁর ঈমান বিন্দুমাত্রও নড়বড়ে হয়নি। তার চাচা তার স্থিরতা দেখে তাকে ছেড়ে দেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 22-23-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত

যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

ইথিওপিয়া এবং মদিনায় মাইগ্রেশন

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। উসমান ইবনে আফফান এবং তার স্ত্রী রুকাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার, ব্যবসা এবং বাড়িঘর ছেড়ে চলে যান। কিছুকাল পরে, তারা শুনতে পায় যে মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কায় ফিরে আসেন, যার মধ্যে উসমান এবং তার স্ত্রী রুকাইয়াহ , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তারপর তারা বুঝতে পারেন যে খবরটি মিথ্যা। শেষ পর্যন্ত মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কাতেই থেকে যায়। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অফ দ্যা প্রফেট, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১-২ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , ২২-২৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, এই ঘটনাটি যা কিছু সাহাবীর হিজরত নিয়ে আলোচনা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, ইথিওপিয়ায়।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

কুরআনের হক পূর্ণ করা

সকল সাহাবীদের মত, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন এবং এর অধিকার আদায়ে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতেন। এর মধ্যে এক সময়ে পবিত্র কুরআনের দশটি আয়াত অধ্যয়ন করা এবং পরবর্তী আয়াতগুলিতে যাওয়ার আগে সেগুলির শিক্ষাগুলিকে তার জীবনে প্রয়োগ করা জড়িত।

পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার বলেছিলেন যে আধ্যাত্মিক হৃদয় যদি পবিত্র হয় তবে তারা কখনই পবিত্র কুরআনে পূর্ণ হবে না। অন্য একটি অনুষ্ঠানে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি পবিত্র কুরআন না দেখে একটি দিন অতিবাহিত করতে অপছন্দ করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তিনটি জিনিসের একটি। তিনি একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা একটি পুণ্য এবং এর উপর আমল করা একটি কর্তব্য।

তিনি পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন লেখকও ছিলেন, যিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে লিখে রাখতেন।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সমগ্র পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাকে এমনভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন যে তিনি নামাজের এক চক্রে পুরো পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ২৭-২৮ ও ৩০ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা লজ্জাজনক যে আজকাল অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে এমন একজনকে মনে করে যে এর শব্দগুলি মুখস্থ করেছে, তা নির্বিশেষে যে তারা এর শিক্ষাগুলি বোঝে এবং আমল করে। এই ধরনের ব্যক্তিকে এমন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো না যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। সত্যিকার অর্থে এটি মুখস্থ করার সাথে এর অধিকার পূরণ করা জড়িত।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে

যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও

অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

জ্ঞানের বাণী – ১

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনটি জিনিস তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ২৮-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রিয় ছিল তা ছিল ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো।

মহান আল্লাহ মানুষকে তারা যা করে তাই দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ যদি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তিনি তাদের স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো ঠিক একই রকম। যে ব্যক্তি এই নেক আমল করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে অন্যকে পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাত থেকে পান করানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামের সর্বোত্তম ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 6236 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যকে খাওয়ানো এবং অন্যদেরকে সদয় কথা বলে অভিবাদন করা ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের উচিত এই সৎ কাজের উপর কাজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যদের বিশেষ করে দরিদ্রদের নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে খাওয়ানো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর ফলই হয়, কারণ সহীহ বুখারি, 1417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে এটি তাদের থেকে রক্ষা করবে। বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন। এটি মানুষকে এই সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত দেয় না।

দ্বিতীয় জিনিসটি যা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রিয় ছিল তা হল উলঙ্গ পোশাক।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যের যেকোনো ধরনের বৈধ প্রয়োজন একজনের শক্তি অনুযায়ী পূরণ করা উচিত এবং যদি কোনো মুসলমান দেখতে পায় যে তারা এই সাহায্য প্রদান করতে পারে না, তাহলে তাদের উচিত একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে এমন একজনের কাছে নির্দেশ দেওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে

তারা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্যকারীর মতো একই পুরস্কার পাবে। জামি আত তিরমিযী, 2671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্যদেরকে এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে তাদের উপকার হয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান কামনা না করে কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিলের দিকে পরিচালিত করে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা অন্যদের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা তাদের প্রয়োজনের সময় আটকা পড়ে যেতে পারে।

মুসলমানরা যদি মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, যাতে তারা আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এর একটি দিক হল ভালো উপদেশের মতো যা কিছু আছে তা দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করা।

একজনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা উচিত যা তাদের গর্বিত হতে বাধা দেবে। যথা, তারা অভাবীকে যে সাহায্য দেয় তা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন, এবং তাই তাদের অবশ্যই প্রকৃত মালিকের ইচ্ছানুযায়ী গরীবদের সাহায্য করার মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে হবে। বাস্তবে, দরিদ্ররা তাদের সাহায্যকারীকে একটি উপকার করছে কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। প্রয়োজনে কেউ না থাকলে মানুষ অনেক পুরস্কার লাভের এই পদ্ধতিটি হারিয়ে ফেলত।

উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে শেষ জিনিসটি ছিল পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রজ্ঞার বাণী – ২

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার কিছু ফজিলত ও কর্তব্যের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 29-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা হল ধার্মিক লোকদের সাথে মেলামেশা করা একটি পুণ্য এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করা একটি কর্তব্য।

এটি উত্তম সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় যে কথাটি বলেছিলেন তা হল পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা একটি নেকী এবং এর উপর আমল করা একটি কর্তব্য।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

তৃতীয় যে কথা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন তা হল কবর যিয়ারত করা একটি পুণ্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া একটি কর্তব্য।

মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোধগম্য হয় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের

অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তারা সেখানে পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় ।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরের কথাটি হল যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া একটি পুণ্য এবং তাকে অসিয়ত করতে বলা একটি কর্তব্য।

সহীহ মুসলিম, 6551 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মুসলিম অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যায় সে জান্নাতের বাগানে থাকে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও, নিঃসন্দেহে এটি একটি মহান কাজ, একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা অন্য কোন কারণে যেমন লোক দেখানোর জন্য এটি করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না।

উপরন্তু, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার আদব ও শর্ত পূরণ করতে হবে। এতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই দিন এবং বয়সে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করা সহজ হয় যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের দেখতে যান কারণ একজন অসুস্থ ব্যক্তি সারা দিন বিশ্রামে থাকবেন। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা। যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে তারা হয় কোন পুরষ্কার পাবে না বা তারা কীভাবে আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই ধার্মিক কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

জ্ঞানের বাণী – ৩

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন যা কল্যাণকে নষ্ট করে দিতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 29-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন যে, যে আলেম থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না এবং যে জ্ঞানের উপর আমল করা হয় না তা কল্যাণের অপচয়।

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে অন্যান্য কারণে যেমন জনপ্রিয়তা এবং পার্থিব জিনিস লাভের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করে এবং তারা একটি কেন্দ্রীয় আসনের আকাঙ্ক্ষার কারণে একদিকের আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হন না। যখন তাদের অভিপ্রায় এইরূপ হয়ে গেল, মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব দূর করে দিলেন এবং এইভাবে তারা এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব

ফেলে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলমানদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে যদিও বছরের পর বছর ধরে উপদেষ্টার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো উল্লেখ করেছেন যে, সঠিক উপদেশ যা গ্রহণ করা হয় না তা ভালোর অপচয়।

অহংকার একজনকে এইভাবে আচরণ করতে পারে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং

মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি । প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো উল্লেখ করেছেন যে, যে মসজিদে নামায পড়া হয় না, তা কল্যাণের অপচয়।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের

উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও উল্লেখ করেছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি কপি যা থেকে পড়া হয় না, তা কল্যাণের অপচয়।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো উল্লেখ করেছেন যে, যে সম্পদ ভালো উপায়ে ব্যয় করা হয় না, তা ভালোর অপচয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং

টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো উল্লেখ করেছেন যে, পার্থিব বিলাসিতার পেছনে ছুটতে গিয়ে তপস্বী জ্ঞান করা কল্যাণের অপচয়।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই একজন মুসলিম যার কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী মানুষ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং

কাজগুলি তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলমানকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলমান এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের হৃদয়কে সমস্ত নিরর্থক ও অকেজো পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহকে আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি,

৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলমান জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক

অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড় জগত তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর , হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে ।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করা কল্যাণের অপচয়।

তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ডাকে গাফিলতি করে জীবনযাপন করে, সে দুনিয়াতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা তাদের জন্য ধৈর্য্য ধরা ও সাড়া দেওয়া বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। . একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা

করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয় তবে এটি বোধগম্য হয় যে কেউ গাফিলতিতে বাস করার পরিবর্তে এখনই, আজকে এর প্রতিক্রিয়া জানাবে। যদি কেউ গাফিলতি করে শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায় তবে কোনো কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

সাঃ) এর জীবদ্দশায় মদিনায় জীবন

মাইগ্রেশনের পর ১ ম বছর

একটি সুন্দর উত্তরাধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল মহান আল্লাহর ঘর, মসজিদে নববী নির্মাণ। জমিটি দুই এতিম বালক সুহাইল ও সাহল (রাঃ)-এর ছিল, যারা বিনা মূল্যে জমিটি প্রদান করেছিলেন কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 165-166-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের

কূপ আকারে চলমান দাতব্য তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নেক আমল করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

বিশ্বের সেরা স্থান

মদিনায় পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মসজিদটি প্রাথমিকভাবে ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যার উপরে খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি একটি হালকা ছাদ ছিল। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এর কোনো উন্নতি করেননি। কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এটিকে বড় করে তোলেন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে যেভাবে ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এর কাঠের স্তম্ভগুলিও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর খিলাফতকালে উসমান ইবনে আফফান রা. তিনি এর দেয়ালগুলি কাটা পাথর ও প্লাস্টার দিয়ে, পাথরের স্তম্ভ এবং সেগুনের ছাদ দিয়েছিলেন। তিনি সুনানে ইবনে মাজা, 738 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে কার্যকর করছিলেন। এতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, এমনকি একটি মসজিদ যত ছোট হোক। চড়ুইয়ের বাসা হোক বা ছোট হোক, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 201-202-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

ভ্রাতৃত্ব

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহযাত্রী মুহাজিরগণ এবং সাহায্যকারী আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন , আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে ভাই ভাই হওয়ার উপদেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে আফফান এবং আওস ইবনে সাবিত (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 39-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে একসময় তাদের দৃঢ় সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য

পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মাইগ্রেশনের পর 2 য় বছর

বদরের যুদ্ধ

একটি করুণাময় আইন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের বিজয় লাভের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি করবেন সে বিষয়ে তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনেক অপরাধ ও যুদ্ধের জন্য তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরামর্শ অপছন্দ করেন। তারপর আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের মৃত্যুদন্ড থেকে ক্ষমা করার পরামর্শ দেন এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা ক্রয় করার অনুমতি দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উপদেশে সন্তুষ্ট হন এবং এর উপর আমল করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 305-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

সর্বোত্তম আচরণ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য মদিনা ত্যাগ করেন, যা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে বদর যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, তখন তিনি তাঁর জামাতা উসমান ইবনেকে নির্দেশ দেন। আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মদিনায় থাকতে এবং তাঁর স্ত্রীকে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা, রুকাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লালন-পালন করেন, কারণ তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গিয়েছিলেন। এই অসুস্থতা থেকে দূরে। মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধের মালপত্রের একটি অংশ প্রদান করেন যা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে তিনি বদর যুদ্ধের একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 315-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সময় অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার

গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে ভালো সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মন্দ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয় কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্রভাবে এবং তারপরও তাদের সাহায্য করা

উচিত যেগুলি ভাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করা উচিত কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

একটি সুখী বিবাহ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা এবং উসমান ইবনে আফফানের স্ত্রী রুকাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তাঁর অপর কন্যা, উম্মে কুলতুম উসমানের কাছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। বিয়ের পর, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কন্যাকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে সর্বোত্তম স্বামী হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 54-55-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 110 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহ ছিলেন, যিনি উসমানকে উম্মে কুলতুমকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই কন্যাকে একের পর এক উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে বিবাহ করেছিলেন তা তাঁর মহান গুণের ইঙ্গিত দেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কন্যার সাথে তাঁর বিবাহের কারণেই তাঁকে ডাকা হয় ‘ধুন- নূরাইন ’ অর্থাৎ দুটি আলোর অধিকারী।

মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একজনকে বেছে নিয়ে সঠিক জীবনসঙ্গী অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 5090 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন একজনকে বিয়ে করা

গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি দেখা উচিত তা হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি।

পরিশেষে, একজন মুসলিম যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন তারা তাদের পত্নীর পাওনা কি অধিকার, তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। জ্ঞান একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

একটি বুদ্ধিমান চুক্তি

মুসলমানরা যখন মদিনায় হিজরত করে তখন একমাত্র পানি যা পান করার উপযোগী ছিল তা ছিল রুমাহ কূপ , যেটি ছিল এক ইহুদীর মালিক, যারা এটি ব্যবহার করার জন্য লোকদের কাছ থেকে চার্জ করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে তা কেনার জন্য এবং জান্নাতে উত্তম কিছুর বিনিময়ে মদিনাবাসীকে দান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা 20,000 রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কিনে মদীনাবাসীকে দান করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 57-58 এবং জামি আত তিরমিযী, 3703 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে ।

সহীহ মুসলিম, 2336 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। প্রথমটি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে তার জন্য ব্যয় করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে। দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহকে অনুরোধ করে, যে বাধা দেয় তাকে ধ্বংস করতে।

এই হাদিসটির উদ্দেশ্য হল একজনকে উদার হতে এবং কৃপণতা এড়ানোর জন্য উত্সাহিত করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দান-খয়রাতের সাথে জড়িত নয় বরং এর সাথে নিজের প্রয়োজন এবং পরিবারের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করাও অন্তর্ভুক্ত কারণ ইসলাম এটির নির্দেশ দিয়েছে। যে কেউ এই উপাদানগুলিতে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পদ ধ্বংস হওয়ার যোগ্য কারণ তারা তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বাস্তবে সম্পদকে অকেজো করে তোলে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ

যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা কখনই সামগ্রিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় না কারণ একজন ব্যক্তিকে এক বা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বর অধ্যায় 34 সাবা, 39 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে দান করার ফলে কারো সম্পদ কমে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

"...কিন্তু আপনি [তাঁর পথে] যা কিছু ব্যয় করবেন - তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন..."

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, পরাক্রমশালী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটি সমস্ত নিয়ামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, শুধু সম্পদ নয়। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদের নিয়ামতকে সঠিকভাবে উৎসর্গ করতে এবং ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়, তবে ফেরেশতার দ্বারা তাদের আশীর্বাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা মহান আল্লাহ কবুল করতে পারেন। তাই, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক, যাতে তারা আরও বেশি করে যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অন্যথায়, তারা চিরতরে আশীর্বাদ হারাতে পারে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মাইগ্রেশনের পর ৩ য় বছর

উহুদের যুদ্ধ

অসুবিধার মধ্যে বাধ্যতা

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দেহ অমুসলিমদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা অবগত হন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন যাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইসলাম ভালোর জন্য। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের বেদনাদায়ক ক্ষত এবং

ক্লান্ত শরীর সত্ত্বেও, অমুসলিমদের অনুসরণে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সাহাবীগণ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেন অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 172:

"যারা [মুমিনদের] আঘাতের পর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সাড়া দিয়েছিল তারা আঘাত করেছিল। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 67-68-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা

হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর

নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

যখন অন্যরা চলে যায়

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছয় বছর বয়সী পুত্র, যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতিও ছিলেন, মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 55-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কয়েক বছর পরে, উসমানের স্ত্রী উম্মে কুলতুম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাও মারা যান। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছেন যে, যদি তাঁর আর একটি অবিবাহিত কন্যা থাকত, তবে তিনি তাকেও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ দিতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 56-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি তাঁর চল্লিশটি কন্যা থাকে তবে তিনি তাদেরকে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে একের পর এক বিয়ে দেবেন, যতক্ষণ না তাদের একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা পৃষ্ঠা ১৬৩- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

প্রতিদিন মানুষ হারাচ্ছে তাদের প্রিয়জনকে। এটি একটি অনিবার্য পরিণতি। একজন মুসলিম অনেক কিছু মনে রাখতে এবং কাজ করতে পারে যা তাদের এই অসুবিধার সময় সাহায্য করতে পারে। একটি বিষয় হল পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। অর্থ, কেউ যা হারিয়েছে তার জন্য দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের উচিত ভাল জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত যা তারা চলে গেছে যার মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে, যেমন তাদের ভাল পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা। যখন কেউ এটির প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে তাকে না জানার পরিবর্তে তাকে হারানোর আগে তাকে চেনা ভাল ছিল। এটি বিবৃতির অনুরূপ, আদৌ প্রেম না করার চেয়ে ভালবাসা এবং হারিয়ে যাওয়া ভাল। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই বিবৃতিটি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয় এবং অপব্যবহার করা হয় তবে এইভাবে ব্যবহার করা হলে এটি সঠিক এবং সহায়ক।

উপরন্তু, একজন মুসলিম যে নিঃসন্দেহে পরকালে বিশ্বাস করে তার সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য মিলিত হয় না। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা শুধুমাত্র পরলোকগত পৃথিবীতে আবার দেখা করার জন্য এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই মনোভাব একজনকে এই ধরনের অসুবিধার সময় রোগীকে অবশিষ্ট রাখতে সাহায্য করতে পারে। এবং এটি তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে যাতে তারা আশ্রয়ের বাগানে তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের শেষ বিশ্রামস্থলে পুনরায় মিলিত হতে পারে, চিরতরে।

বিশ্বস্ত হওয়া

যখনই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে বিদায় নিতেন, তিনি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সর্বদা এর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে নিয়োগ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, তিনি ধু আমর নামে পরিচিত একটি অভিযানে রওনা হন এবং উসমান ইবনে আফফানকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 1 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

মাইগ্রেশনের পর ৪ র্থ বছর

বনু নাদির

প্রতিশোধ ভুলে যাওয়া

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর চতুর্থ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি অমুসলিম গোত্র বনু নাদিরকে পরিদর্শন করেন, যার কাছে তিনি পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন। সহায়তা এবং শান্তির সাথে, আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য। তারা উত্তর দিয়েছিল যে গোপনে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করার সময় তারা তাকে সাহায্য করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে ঐশ্বরিক ওহী পেয়েছিলেন এবং তাদের মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি চলে যান এবং মদিনায় ফিরে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তারপর বনু নাদিরদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন যাতে তারা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে এবং সুরক্ষা দেয়। মুনাফিকরা বনু নাদিরকে থাকার জন্য অনুরোধ করল এবং তাদের সমর্থন দিল। তারা দাবি করেছিল যে, যদি বনু নাদিররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তবে তারা তাদের সমর্থন করবে, যদি বনু নাদির যুদ্ধ করে তবে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যদি তাদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয় তবে তারা তাদের সাথে চলে যাবে। তাদের এটি বনু নাদিরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত মুনাফিকরা কিছুই করেনি যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ

তাদের উপর সন্তুষ্ট, বনু নাদিরকে অবরোধ করেন, তখন তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা তাদের রক্তকে বাঁচিয়ে দিন এবং পরিবর্তে তাদের নিরাপদ পথ প্রদান করুন যাতে তারা তাদের জিনিসপত্র সহ এলাকাটি খালি করতে পারে। . বনু নাদিরদের বিরুদ্ধে তাদের মন্দ পরিকল্পনার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত যা কিছু বহন করতে পারে তা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 100-101-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বদর

উহুদের যুদ্ধ ছেড়ে যাওয়ার আগে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান পরের বছর বদরে আবার মিলিত হওয়ার জন্য দুই সেনাবাহিনীর জন্য নিয়োগের ঘোষণা দেন। সময় এলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় 1500 সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং অমুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করে বদরে শিবির স্থাপন করেন। অমুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রায় 2000 সৈন্য ছিল কিন্তু বদর থেকে দূরে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন এবং যদিও তিনি নিজেই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মক্কায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হতে তারা ভীত হয়ে পড়ায় তারা তার কোন বিরোধিতা না করে মক্কায় ফিরে আসেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বদরে থেকে যান এবং কিছু লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। আট দিন পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময় ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বদর ত্যাগ করেন যা আরব জনগণের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা 306-307-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের দৃঢ়তার কারণে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয় দান করেছিলেন যা সামরিক বিজয়ের চেয়ে সারা আরব জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান

এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয় । পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ

মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

মাইগ্রেশনের পর ৫ ম বছর

আহযাবের যুদ্ধ

একটি প্রস্থান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দক /আহজাবের যুদ্ধ শুরু হয় । যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে তিনি শত্রুদের মদিনার একমাত্র পাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। থেকে সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। শত্রু বাহিনী মদিনা ও পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে। মদিনার মধ্যে একটি অমুসলিম উপজাতি, বনু কুরাইজা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, তাদের দুর্গগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন অমুসলিম অমুসলিম সেনাবাহিনী থেকে ভ্রমণ করে বনু কুরাইজার একজন নেতা কাব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পরিবর্তে অমুসলিম

সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। -মুসলিম বাহিনী এবং সাহাবীদের উপর আক্রমণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনার মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়. কাব বিন আসাদ তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দেন এবং যে দলিলটি লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। মদিনার বাইরে ও ভিতরে শত্রুরা থাকায় উদ্বেগ ও ভয় বেড়ে গেল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ এই যুদ্ধ জুড়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করলেন। অমুসলিম বাহিনী যা তাদের শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে এবং তাদের বিভ্রান্তি ও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করে। আবহাওয়া তাদের বিপক্ষে থাকায় অমুসলিমরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা সফলভাবে পরিখা ভেদ করে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 154-155-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিম সৈন্যদল চলে যাবার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শত্রু শিবির থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এমন কিছু না করার জন্য। আমার মুখোমুখি। শত্রু শিবিরে পৌঁছে তিনি অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করলেন। হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ধনুক বোঝাই করে আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে দেওয়া আদেশের কথা মনে পড়লে তিনি তাঁর হাত আটকে রাখেন। তিনি গোপনে অমুসলিমদের একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন যে তারা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তাদের সরবরাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল, মহান আল্লাহ প্রেরিত বাতাস তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তারা মুসলমানদের খনন করা পরিখা ভেদ করতে পারেনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী (সাঃ) এর মহান জীবন, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 1383-1384-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়, এই মহান ঘটনার মতো, একজন মুসলমানের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা উচিত। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের শারীরিক পথপ্রদর্শকের দিকনির্দেশনাকে বিশ্বাস করে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ঘটবে তাই অধৈর্যতা দেখানোর পরিবর্তে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখা উত্তম যা কেবলমাত্র আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তির জীবনের অগণিত উদাহরণগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যখন একজন ব্যক্তি কিছু পাওয়ার পরে অনুশোচনা করতে চেয়েছিলেন। এবং যখন তারা কিছু ঘটতে অপছন্দ করে শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য জরুরী যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদি তারা কঠিন থেকে মুক্তি পেতে চায়, যেমন, মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে নেই তার অর্থ, ভাগ্যের উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বোকামি।

বনু কুরাইজা

বিশ্বাসঘাতকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ হয় । মহান আল্লাহ অমুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তাদের শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং এর পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হন । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজা একজন সাহাবী সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয়েছিল, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগেই ভাল করে চিনতেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের রায়ের জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে বনু কুরাইজার সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 166-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি খুব সাধারণ রায়, এমনকি এই দিন এবং যুগেও। উপরন্তু, তাদের অপরাধ ছিল একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, পুরো জনপদে ভরা। তাদের পরিবর্তে নির্বাসিত হলে তারা আবার মদিনার সাথে যুদ্ধ করত।

যারা তার দুর্বল বান্দাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রতিশোধ নেন কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার করবে না, বিশেষ করে যারা প্রতিরক্ষাহীন বলে মনে হয় বাস্তবে তাদের রক্ষাকর্তা এবং প্রতিশোধদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এবং বিশেষ করে বিচার দিবসে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজগুলো তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ তাদের অত্যাচারীর কাছে স্থানান্তরিত করবেন। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর কঠোর আনুগত্যের অধীন করে মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং

ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিসের প্রতিশোধ নিতে হবে।

মাইগ্রেশনের পর ৬ষ্ঠ বছর

আগুনের দুটি জিহ্বা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরা এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের একটি দল তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে একটি কূপ ঘিরে ফেলে। কূপের আশেপাশের এলাকা ঠাসাঠাসি হওয়ায় দুইজন সাহাবী, একজন মদীনার এবং অন্যজন মক্কার, তাদের সাথে সামান্য ঝগড়া হয়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই সুযোগটি নিয়ে আরও বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এই দাবি করে যে, মক্কার হিজরতকারীরা তাদের সমস্যা সৃষ্টি করছে। মক্কার হিজরতকারীদের মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য মুনাফিকদের সমালোচনা করতে শুরু করেন। জায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) নামে এক শিশু তার খারাপ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর দিল। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তলব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বড় শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও এই শব্দগুলি বলেননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন পদক্ষেপ নেননি। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 7-8 অবতীর্ণ করেছেন:

"তারা তারা যারা বলে, "যারা আল্লাহর রসূলের সাথে আছে তাদের উপর ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" আর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আমানত আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। তারা বলে, "যদি আমরা আল- মদীনায়

ফিরে আসি, [ক্ষমতার জন্য] যত বেশি সম্মানিত হবে, তত বেশি বিনয়ীকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দেবে।" আর সম্মান আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।"

এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়েদ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর কান ধরে সান্ত্বনা দেন এবং মন্তব্য করেন যে তিনিই তাঁর কান মহান আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। . ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 213-215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিমুখী হওয়া ভন্ডামির লক্ষণ। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য যাতে কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করার ইচ্ছা থাকে। তারা বিভিন্ন লোকেদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রতি অপছন্দকে আশ্রয় করে। তারা লোকদের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে নিজেদেরকে আগুনের দুটি জিভ দিয়ে দেখতে পাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 14:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন তারা বলে: "আমরা ঈমান এনেছি" কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে দেখা করে (গোপনে), তারা বলে: "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা নিছক ঠাট্টা করছিলাম।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ

লেটিং থিংস গো

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক । তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুয়াত্তাল (রাঃ) একজন সাহাবী, সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল (রাঃ) এর পাশ দিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত ক্যাম্পসাইটে ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা

ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরে, মহান, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁর পিতা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই অপবাদ ছড়ানোয় অংশ নেওয়া তাঁর আত্মীয়কে আর আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন না। মহান আল্লাহ, তারপর অধ্যায় 24 আন নুর, 22 নং আয়াত নাজিল করেছেন, তাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে অন্যের ভুল ক্ষমা ও উপেক্ষা করতে উত্সাহিত করেছেন:

" আর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও সম্পদশালী তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের [সাহায্য] না করার শপথ না করে এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এরপর আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোষণা প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর আত্মীয়কে সাহায্য করতে থাকেন। জামে আত তিরমিযী, 3180 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা

বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তি

সরল পথ অবলম্বন কর

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে তাঁর শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বার্তাটি দেওয়ার পর তাকে আল্লাহর ঘর, কাবা প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে কখনও তা করতে পারেননি। , তা - ই করলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 227-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের বাইরে কিছু না করে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে কঠোরভাবে মেনে চলা অর্থ গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

রিদওয়ানের অঙ্গীকার

খবর যাচাই

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে তাঁর শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পর এই বার্তা পৌঁছে দেন যে তিনি মক্কার অমুসলিমদের হাতে আটক ছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কা ত্যাগ করবেন না, কারণ তিনি কেবল নিরস্ত্র অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করেননি বরং মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবেও প্রবেশ করেছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাষ্ট্রদূতদের সবসময় সম্মানের সাথে আচরণ করা হয় এবং তাদের ক্ষতি করা যুদ্ধ ঘোষণা। এই

দিন এবং যুগেও এটি সত্য । অঙ্গীকারের সময় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাত অন্য হাতে রেখে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর হাতটি উসমান (রা.)-এর হাতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার। মহিমান্বিত, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই অঙ্গীকারের পর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবিত আছেন এবং অবশেষে তিনি তাদের শিবিরে ফিরে আসেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 228 এবং সহীহ বুখারি, 4066 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই যুগে সমাজের একটি বড় সমস্যা হল সমাজে ভুয়া খবর ছড়ানো। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর কাজ করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যদিও, এই শ্লোকটি একটি দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয় যা এখনও অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই বিষয়ে অমনোযোগী এবং এটি যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্যটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে তথ্যটি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি মুসলমানদের কীভাবে প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা শুধুমাত্র সমাজে দুর্দশা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে যাচাই করা তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয় না তা জেনেও তারা ত্যাগ করবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

একটি পরিষ্কার বিজয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অ-মুসলিমদের পক্ষে ছিল বলে মনে হয়। মক্কার মুসলমান। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট, চুক্তির অংশ ছিল (ওমরা) না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। দশ বছরের শান্তির এই চুক্তি বাস্তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল। এই চুক্তির আগে যখনই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে মিলিত হতো তখন প্রায়ই কোনো না কোনো যুদ্ধ হতো কিন্তু চুক্তির কারণে যুদ্ধ শেষ হলে যখনই এই লোকেরা মিলিত হতো তারা কেবল কথা বলতো। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলে তারা তা গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম তার আগমনের পরের আগের বছরগুলোর তুলনায় পরবর্তী দুই বছরে অনেক বেশি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। এই সুস্পষ্ট বিজয় মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অধ্যায় 48 আল-ফাত প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 1:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 231-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বহু বছর পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, ইসলামে হুদাইবিয়ার চুক্তির চেয়ে বড় কোন বিজয় নেই। যদিও মানুষ তখন এর সুফল উপলব্ধি করতে পারেনি, তবুও তাদের অদূরদর্শিতার কারণে মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য পর্যায়ক্রমে বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় তিনি সুহায়ল বিন আমর (রা.)-এর ভক্তি ও আনুগত্য দেখেছিলেন, যিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যদিও হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরোধিতা করেছিলেন। তার উপর হতে আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপরে তার ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, ইসলাম দান করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন।

এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

মন্দ চক্রান্ত ব্যর্থ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর, অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে সন্ধি করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন, যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অনুগ্রহ করে বলে মনে হয়। মক্কার অমুসলিমরা। যার একটি ছিল মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। এটা স্পষ্ট ছিল যে মক্কার অমুসলিমরা শুধুমাত্র এই দাবি করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাদের ঐক্য ভেঙে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন। একজন সাহাবী, আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বন্দীদশা থেকে রক্ষা পেয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনা থেকে আবু বাসির (রাঃ) কে উদ্ধার করার জন্য দু'জন লোককে পাঠিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিকে সম্মান জানিয়ে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য হস্তান্তর করেন। মক্কায় ফেরার পথে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু পালিয়ে যান এবং অবশেষে মদীনা ও মক্কা থেকে দূরে অন্য এক

নির্জন এলাকায় পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর, যখনই কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কায় তাদের কারাগার থেকে পালিয়ে যান, তখনই তারা আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যোগ দেন। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে শেষ পর্যন্ত তারা মক্কার অমুসলিম নেতাদের বণিক কাফেলাকে লুটপাট করতে শুরু করে, কারণ শান্তি চুক্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র মদিনার নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এতে মক্কাবাসীদের জন্য মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। তারা অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, তাঁর কাছে আবূ বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর বাহিনীকে মদিনায় ডাকার জন্য অনুরোধ করেন যাতে অভিযান ও লুটপাট বন্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হন এবং এই ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় হিজরত করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 240-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...*কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?*

মাইগ্রেশনের পর ৭ ম বছর

খায়বারের যুদ্ধ

ন্যায়বিচার ধরে রাখুন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে, তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম উপজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের যে শান্তিচুক্তি ছিল তা অবিরাম ভঙ্গ করার কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। খায়বারের অমুসলিমরা তাদের একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কৃষি জমির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর এলাকা থেকে বহিষ্কার করতে চাইলে তারা তাঁর সাথে চুক্তি করে। তারা কৃষি জমির দেখাশোনা করবে এবং অর্ধেক ফসল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হস্তান্তর করবে এই শর্তে যে তাদের জমি থেকে বহিষ্কার করা হবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মত হন কিন্তু এই ধারা যোগ করেন যে মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিলে ভবিষ্যতে তাদেরকে বহিষ্কার করতে পারে। তারপর তিনি একজন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে প্রতি বছর তাদের কাছে যেতে এবং তাদের অর্থ গ্রহণ করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এই অমুসলিমরা আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে ঘুষ

দেওয়ার চেষ্টা করেছিল , যাতে তিনি তাদের অর্ধেকেরও বেশি রাখার অনুমতি দেন যা সম্মত হয়েছিল। তিনি উত্তর দিলেন যে, যদিও পৃথিবীতে কেউ তাঁর কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল না, এবং অমুসলিমরা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করত, তবুও তিনি পবিত্রতার প্রতি ভালোবাসা ছেড়ে দেবেন না। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাদের প্রতি তাঁর অপছন্দ তাকে তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে এবং ন্যায়বিচার করতে বাধা দেয় না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 270-271-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয় । এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

সফর (ওমরা)

দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে, তিনি সফর (ওমরা) পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা হন, যেমনটি আগের বছর মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে একমত হয়েছিল। তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এই খবর প্রচার করছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত কষ্ট ও কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মহান আল্লাহর ঘর, কাবাঘরের কাছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর যারা সেদিন শক্তি প্রদর্শন করেছিল তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, তারা আংশিকভাবে আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 308-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি কোন ঘাটতি অর্থ, দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা অবলম্বন করে তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের কাছে

পেশ করা হয় তখন তারা তা সহজেই গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে দেখে না যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কাছে কোন পার্থিব জিনিস রয়েছে বা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য রয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি তাদের অজানা। অর্থাৎ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই বাস্তবতা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখতে হবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলমান সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে ভয় পায় না বা তাদের নম্রতা তাদের অপমানিত এবং অসম্মানিত বলে মনে করে না।

মাইগ্রেশনের ৪ ম বছর

মক্কা বিজয়

সমবেদনা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে যে কেউ আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে প্রবেশ করবে সে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে কেউ নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রাখবে নিরাপদ থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত যে কেউ আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফে আশ্রয় চাইবে, সে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে নিরাপদ থাকবে। তিনি সেনাবাহিনীকে শুধুমাত্র তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু কয়েকজনকে তালিকাভুক্ত করেছিল যাদেরকে পাওয়া গেলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। এই লোকেদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়নি কারণ তাদের অপরাধ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অনেক বড়,

যা এই দিন ও যুগেও একটি মূলধনের অপরাধ। কিন্তু যখন মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে তখন এই লোকদের একজন উসমান ইবনে আফফানের কাছে পালিয়ে যায় এবং তার কাছে নিরাপত্তার জন্য ভিক্ষা করে। তিনি পালাক্রমে লোকটিকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পক্ষে আবেদন করলেন। যদিও তার অপরাধ গুরুতর ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তবুও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারণে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 402-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

হুনাইনের যুদ্ধ

অসুবিধায় অবিচল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী অভিভূত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে। অবশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের ডেকে আনার পর, তারা সবাই এগিয়ে গেল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 451-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার

পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

তায়েফ অবরোধ

নম্রতা এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তায়েফের অমুসলিমরা প্রায় 30 দিন অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা পরাজিত হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর মুসলিম বাহিনীকে তায়েফ থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য দোয়া করেন। সম্ভবত, মহান আল্লাহ তায়েফের মুসলমানদেরকে তায়েফ জয় করতে বাধা দিয়েছিলেন, কারণ মদিনায় হিজরতের আগে, যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফবাসীদের ধ্বংস করার বিকল্প দেওয়া হয়েছিল কারণ তার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার। কিন্তু তিনি এই বিকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করবে। এটি সহীহ বুখারি, 3231 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। সুরক্ষার এই পছন্দটি অব্যাহত ছিল এবং মুসলমানদের তায়েফ জয় করতে বাধা দেয়।

উপরন্তু, তায়েফের লোকেরা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া এই দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য এবং মদিনায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। . ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 476-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলমান এটি বুঝতে পারে সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, তবে সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনই শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশী নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এবং ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই স্বর্গীয় গুণাবলীর উপর কাজ করা উচিত মানুষের সাথে নম্র হয়ে বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

মাইগ্রেশনের পর 9 ম বছর

তাবুকের যুদ্ধ

দরকারী সম্পদ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অভিযানে জনগণকে অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করেছেন এবং একটুও পিছপা হননি। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 3701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস আলোচনা করে যখন উসমান ইবনে আফফান রা. তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, 1000 স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। তিনি তাদের কোলে ঢেলে দিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যিনি মন্তব্য করেছেন যে তারপর থেকে কিছুই তার বিশ্বাসের ক্ষতি করতে পারে না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 3 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা পরকালে গরীব হবে যদি না তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর অর্থ এই যে, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে, অর্থাৎ হয় নিরর্থক জিনিসের জন্য যা তাদের আখিরাতে কোন উপকার করে না, অথবা তারা এমন পাপ কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় অথবা তারা ব্যয় করে। ইসলামের অপছন্দের মত হালাল জিনিসের উপর যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে বিচারের দিন ধনীরা গরীব হয়ে যাবে কারণ তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং এমনকি তাদের উপর শাস্তিও দেওয়া হবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে গরিব হিসেবে পৌঁছাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি তার জন্য দায়বদ্ধ থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগের জন্য সম্পদ রেখে যাবে।

পরিশেষে, ধনীরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। এবং এই মনোভাব অনেক সম্পদ থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। যেকোন পরিমাণ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একজন ব্যক্তি ধনী হতে পারে যদিও তার কাছে সামান্য সম্পদ থাকে। বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের সম্পদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায় এবং এই মনোভাব তাদের অবসর সময় দেয় যা তাদেরকে সৎ কাজ করতে দেয় যা পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

তাবুকের নবীর খুতবা

একটি ব্যাপক পরামর্শ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানটি যখন তাবুকে পৌঁছে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নোক্ত ভাষণ দেন: “হে মানুষ, সবচেয়ে সত্য কথা হল মহান আল্লাহর কিতাবের। বন্ধনের দৃঢ়তম হল শব্দ (বিশ্বাসের সাক্ষ্য)। সর্বোত্তম ধর্ম হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। জীবনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। সর্বোত্তম বাণী হল মহান আল্লাহর স্মরণ। সর্বোত্তম বর্ণনা হল পবিত্র কুরআন। সর্বোত্তম অভ্যাস হল যেগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। অভ্যাস খারাপ যারা উদ্ভাবিত হয়. সর্বোত্তম পথনির্দেশ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবচেয়ে মহৎ মৃত্যু হচ্ছে শহীদ হিসেবে। সবচেয়ে অন্ধ হচ্ছে হেদায়েতের পর পথভ্রষ্ট হওয়া। সর্বোত্তম আমল হল সেই কাজ যা উপকারী। সর্বোত্তম নির্দেশনা হল যা অনুসরণ করা হয় (উদ্ভাবিত নয়)। সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব (আধ্যাত্মিক) হৃদয়ের। উপরের হাত (দানকারী) নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (যে ব্যক্তি দান করে)। যা সামান্য হলেও যথেষ্ট তা তার চেয়ে উত্তম যা অনেক কিন্তু অপচয়কারী। মৃত্যু যখন সামনে থাকে তখন সবচেয়ে খারাপ ক্ষমা চাওয়া হয়। বিচার দিবসে এর চেয়ে খারাপ অনুতাপ। এমন লোক আছে যারা শুধুমাত্র জুমার নামাজের শেষে অংশ নেয়। এমন কিছু লোক আছে যারা শুধু মহান আল্লাহকে অযথাই স্মরণ করে। গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিহ্বা হল মিথ্যা

কথা বলা। সর্বোত্তম সম্পদ হল আত্মার (তৃপ্তি)। সর্বোত্তম গুণ হল তাকওয়া। জ্ঞানের পরাক্রম হল মহান আল্লাহকে ভয় করা। অন্তরের মধ্যে সর্বোত্তম গুণ হল নিশ্চিততা (বিশ্বাস)। সন্দেহ করা কুফর থেকে। শোকে বিলাপ করা জাহেলিয়াতের যুগ (প্রাক-ইসলামী যুগ) থেকে একটি কাজ। জালিয়াতি জাহান্নামে ছড়িয়ে মাটির হয়. (বেশিরভাগ) কবিতা শয়তান থেকে আসে। মদ পাপের সমষ্টি। নারী (পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য পুরুষ) শয়তানের ফাঁদ। যৌবন হল উন্মাদনার একটি শাখা (নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে)। সবচেয়ে খারাপ আয় সুদ থেকে। নিকৃষ্ট খাদ্য এতিমের সম্পদ গ্রাস করছে। সুখী মানুষ হল সেই ব্যক্তি যাকে অন্যের (কর্ম) দ্বারা সতর্ক করা হয়। তোমাদের একজনকে পরকালের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য (মৃত্যুর) জন্য চার হাত দূরে সরে যেতে হবে। একটি কর্মের মৌলিকতা তার ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আখ্যানের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল অসত্য। যা আসতে হবে সবই হাতের কাছে। মুমিনের নামে শপথ করা একটি ক্ষোভ। মুমিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফর। তার গোশত খাওয়া (গীবত) মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। তার সম্পত্তির পবিত্রতা তার রক্তের পবিত্রতার মতো। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নামে (মিথ্যা) শপথ করে, সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে। যে তার ক্ষমা চাইবে তাকে ক্ষমা করা হবে। যে ক্ষমা করবে, মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি রাগকে দমন করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার দেবেন। যে ব্যক্তি বিপদাপদে অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষতিপূরণ দেবেন। যে ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে, মহান আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। যে ব্যক্তি অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অমান্য করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি শাস্তি দেবেন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। আমি নিজের জন্য এবং আপনার জন্য ক্ষমা চাই।" ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 16-17 এ আলোচনা করা হয়েছে।

আপনার উত্তরাধিকার

মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মসজিদ তাদের সবাইকে বসানোর জন্য খুব ছোট হয়ে গেল। অতএব, তিনি প্রতিবেশী জমি ক্রয় এবং তা প্রসারিত করার জন্য লোকদের প্রতি আহ্বান জানান এবং জান্নাতে আরও ভাল ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায় ২০,০০০ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে এই জমি ক্রয় করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 58-59 এবং জামি আত তিরমিযী, 3703 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের কূপ আকারে চলমান দাতব্য তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নেক আমল করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

বাস্তব বিনয়

সহীহ মুসলিম, 6209 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিনয়ীতার কারণে ফেরেশতারা তাঁর প্রতি লজ্জা পেয়েছিলেন।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন যে, তাঁর জাতির মধ্যে লজ্জা ও বিনয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আন্তরিক ছিলেন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এমনকি যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের বাড়ির গোপনীয়তার মধ্যে থাকতেন এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন তিনি নিজেকে ধোয়ার সময় নিজের পোশাক পুরোপুরি খুলে ফেলতেন না এবং গোসল করার সময় তিনি বসে থাকতেন যেমন তিনি আল্লাহর সামনে লজ্জা পেয়েছিলেন। , মহিমান্বিত। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১১১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে

রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। এটি সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি করা হয় না কারণ এগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং পরিমিতভাবে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

মাইগ্রেশনের পর দশম বছর

বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 152-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে যখন তারা তাদের পরকালের শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ, তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে দেশে ফিরে আসবে কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটা করার জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটা অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে যে যাত্রার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

মাইগ্রেশনের 11 তম বছর

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু

আল্লাহর প্রতি ভক্তি (SWT)

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর অসুস্থতার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে কোন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দ্বারা গৃহীত হবে না যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর বিশ্রামের স্থান দেখতে পান এবং জীবনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়। এবং মৃত্যু। সহীহ বুখারী, 4428 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছিলেন যে কয়েক বছর আগে খায়বারে তাকে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল তা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল এবং অনুভব করেছিল যে এটি থেকে তিনি মারা যাবেন। এটা ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। তার অন্তিম মুহুর্তে, তিনি আকাশের দিকে তার দৃষ্টি তুলে ধরেন এবং সর্বোচ্চ সঙ্গীর কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে। তিনি মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল 63 বছর। তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল একটি উঁচু জায়গায়, জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 343-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে

অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। পরিস্থিতি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষণস্থায়ী আবাস থেকে চিরতরে স্বস্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে একটি উঁচু স্থানে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"... আশা করা যায় যে তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

এবং অধ্যায় 93 আদ দুহা, আয়াত 4-5:

" এবং পরকাল তোমাদের জন্য প্রথম জীবনের চেয়ে উত্তম। আর তোমার প্রতিপালক তোমাকে দিবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

তিনি তার দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর মহান আল্লাহ তাকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তার জাতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং উভয় জগতের সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে ও আখেরাতে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে তা থেকে তাদের বিরত রেখেছিলেন । সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আল্লাহর শেষ রাসুল, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

সাঃ) এর মৃত্যুর পরের জীবন

আবু বক্কর (রাঃ) এর ভাষণ

বাধ্য থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাদের তীব্র দুঃখের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুতে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং হযরত মুসার মতোই ফিরে আসবেন। তিনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর সম্প্রদায়কে চল্লিশ দিনের জন্য রেখেছিলেন।

হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন সেখানে পৌঁছেন তখন তিনি মসজিদে নববীতে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 144 পাঠ করলেন:

“মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া নন। [অন্যান্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে আপনি কি ফিরে যাবেন [অবিশ্বাসের দিকে]? আর যে তার গোড়ালিতে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না..."

অতঃপর নিম্নোক্ত কথাটি বললেন: “আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেন। সুউচ্চ, সরল, তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আপনাকে পথের উপর ছেড়ে দিলেন। এবং স্পষ্ট নিদর্শন এবং ব্যথা ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না. যাদের রব আল্লাহ, পরাক্রমশালী তাদের জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ জীবিত এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত করত, তাদের জানা উচিত যে তিনি মারা গেছেন। মহান আল্লাহকে ভয় কর হে মানুষ! তোমার দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমার প্রভুর উপর ভরসা কর। মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ। মহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সমর্থন করে এবং যারা তার ধর্মকে সম্মান করে। মহান আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে রয়েছে। এটি আলো এবং নিরাময় উভয়ই। এর দ্বারা মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত দান করেছেন। এতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কী হালাল মনে করেন আর কোনটি হারাম। সৃষ্টির মধ্য থেকে কে আমাদের উপর (আমাদের আক্রমণ করার জন্য) অবতীর্ণ হয় তা আমরা পরোয়া করব না। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা জোরালোভাবে লড়াই করব যেভাবে আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে লড়াই করেছি।

হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পর তারা সবাই সত্যকে মেনে নিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা ঘোরা বোধ করেন এবং মাটিতে পড়ে যান এবং অবশেষে স্বীকার করেন যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে মারা গেছেন। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অব দ্য প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 348-349 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 139-141-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর (রাঃ) এর খেলাফত

সত্যকে সমর্থন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এ সময় মক্কা ও মদিনা থেকে আগত সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে সম্মত হন। সহীহ বুখারী, 3667 এবং 3668 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হল ভাল বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব। এটি এবং অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে তাদের খলিফা হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমনকি উমর ইবনে খাতাব নামও রেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য এটি ছিল কোনো যুক্তি বা সমস্যা ছাড়াই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিক কাজটি করতে বেছে নেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেন। তিনি চিন্তা করেননি যে তিনি অন্য কাউকে সমর্থন করলে তার পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে বা তাকে ভুলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এই সঠিক পছন্দের পরেই তার সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবু বক্করের চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সাহাবীগণ এই বরকতময় মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যখন তারা সবাই আবু বক্করকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-কে পরবর্তী খলিফা হতে হবে। . ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ৭৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এইভাবে আচরণ করে না। যারা ভালো কিছু করে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা প্রায়শই শুধুমাত্র যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সমর্থন করে। তারা এমন আচরণ করে যেন অন্যদের ভালো কাজে সহযোগিতা করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। কেউ কেউ আরও নীচে নেমে গেছে এবং তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের খারাপ কাজে সমর্থন করে এবং অপরিচিতদের যারা ভাল করছে তাদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামী সম্প্রদায় দুর্বল হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্য কিছুর চিন্তা না করে সর্বদা কল্যাণের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন করে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে শক্তি ও সম্মান চায়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এমনকি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দের পছন্দ ছিল, তবুও তিনি তাকে স্পষ্টভাবে মনোনীত করেননি। এর একটি কারণ হল, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু এবং নতুন নেতা মনোনীত করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা ছিল। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, নেতৃত্বের জন্য তর্ক করবেন এবং লড়াই করবেন নাকি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করবেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন কিনা তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা। ইতিহাস পরিষ্কারভাবে দেখায়, তারা উড়ন্ত রঙের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল । অতএব, এটি তাদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল এবং ভবিষ্যত মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষা ছিল যে তারা সর্বদা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট থাকে। উপরন্তু, যদি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিযুক্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কিছু লোক সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর নিয়োগে সর্বসম্মতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তারা কেবলমাত্র তারা এটা মেনে নিয়েছে কারণ তারা তা করতে আদেশ করেছিল। অতএব, একটি সুস্পষ্ট আদেশ এড়ানোর অনুমতি দেওয়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বাধা দেয় কারণ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলির অধীনে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হতে হবে। . এটি খলিফা হিসাবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধিকারকে আরও বৃদ্ধি করেছিল, যেমনটি তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। .

একজন আন্তরিক উপদেষ্টা

আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতের সময় উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উভয়ের একজন সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

অর্থ অনুযায়ী ব্যয় করুন

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে একটি মারাত্মক খরা দেখা দেয়। এ সময় উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খাদ্যসামগ্রী বহনকারী একশত উট মদিনায় প্রবেশ করে। বণিকরা তার সাথে ব্যবসা করার জন্য তার কাছে এসেছিল। যখন তারা তাদের অফার করেছিল, তখন তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে তিনি তার পণ্যদ্রব্যের জন্য আরও ভাল অফার পেয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে মহান আল্লাহ তাকে ন্যূনতম দশগুণ লাভের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তারপর সমস্ত খাদ্যসামগ্রী দরিদ্র মুসলমানদের জন্য দান করেছিলেন। এরপর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন যখন তিনি তাড়াহুড়া করছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, মহান আল্লাহ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দান কবুল করেছেন এবং বিনিময়ে তাকে জান্নাতে একটি পাত্রী দিয়েছেন এবং তিনি বিয়ের জন্য ত্বরা করছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে এমন যে কোন সৎ কাজ যার ভিত্তি হারামের উপর

ভিত্তি করে আছে তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি আসলে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যদের সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা আল্লাহ, মহান, একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা পর্যবেক্ষণ করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি একজন মুসলমান তাদের

সম্পদ জমা করে রাখে তবে তারা তা অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে দেবে যখন তারা এর জন্য দায়ী থাকবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফত

ভালো সাহচর্য

উমর ইবনে খাত্তাব তার খিলাফতের সময় উসমান ইবনে আফফানকে ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে রেখেছিলেন। লোকেরা প্রায়শই উমর (রা) এর কাছে যাওয়ার জন্য উসমানের মধ্য দিয়ে যেতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ৭৭-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি উত্তম সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ

দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

ইসলামিক ক্যালেন্ডার

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত আমলে একবার একটি দলিল পেয়েছিলেন যাতে শুধুমাত্র মাসটি লেখা ছিল। তাই, নথিতে উল্লেখিত বছর তিনি কাজ করতে পারেননি। তারপর তিনি একটি ইসলামী ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য প্রবীণ সাহাবীগণকে একত্র করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের ক্যালেন্ডার শুরু হওয়া উচিত যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 225-227- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ইসলামিক ক্যালেন্ডারটি মহররম মাস দিয়ে শুরু করা উচিত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ৭৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল ঐক্যের আরেকটি কাজ, যা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, কারণ সেই সময়ের লোকেরা অতীতের ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে সময়ের বিচার করবে, যার মধ্যে কিছু প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগের সাথে যুক্ত ছিল। ইসলামিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন এটি এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল

যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের

কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা

হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর

পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা

করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

মহৎ আচরণ

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য এবং সিনিয়র সাহাবীগণ, খলিফা, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে সদ্য বিজিত জমিগুলিকে ভাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সৈনিকরা। তিনি প্রথমে কিছু সাহাবীদের কাছ থেকে কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনায় সম্মত হন। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা শুরু থেকেই তাঁর সাথে একমত ছিলেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিবর্তে অমুসলিমদের তাদের জমি রাখার অনুমতি দেন এবং তাদের উপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আরোপ করেন। অমুসলিমরা তার সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছিল কারণ এটি তাদের জীবনে প্রথমবারের মতো অনুভব করেছিল যে তারা, শাসক শ্রেণী নয়, কৃষি জমির মালিক। পূর্ববর্তী শাসনামলে, এই অমুসলিমরা ছিল কেবল শ্রমিক যারা জমি চাষ করত এবং বিনিময়ে কার্যত কিছুই পেত না। সমস্ত আয় শাসক শ্রেণী গ্রহণ করবে যখন তাদের কাছে পয়সা থাকবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত এই অমুসলিমদেরকে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মিত্রতার জন্য উৎসাহিত করেছিল এবং তাদের অনেকেই তাঁর খেলাফতের কারণে সারা দেশে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উমর ইবন আল খাত্তাব , হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস , ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 466-467 এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 79 এ আলোচনা করা হয়েছে ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে তা নিজেদের উপকার করে, অন্যদের নয়। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়।

উপরন্তু, তারা মারা যাওয়ার পরে লোকেরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে কারণ এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"...বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে নিপীড়কের নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল নিজেরাই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হচ্ছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

পরবর্তী খলিফার জন্য পরামর্শ

শাসন

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। তাঁকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর বাড়িতে তাঁর দুই সাহাবী অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফনের অনুমতির জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। , যা সে

রাজি। যখন তাকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার আহ্বান জানানো হয়, তখন তিনি তাদের উপদেশ দেন যে নিম্নলিখিত ছয় জনের মধ্য থেকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করা হবে, যাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর আগে সন্তুষ্ট করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উমর জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র, আবদুল্লাহ বিন উমর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, খলিফা নিযুক্ত হবেন না তবে তিনি পরবর্তীটি বেছে নিতে সহায়তা করতে পারেন। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, শোয়েব আর রুমিকেও নিযুক্ত করেছিলেন, পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জামাতের নামাজের ইমামতি করার জন্য। তিনি পরবর্তী খলিফা হতে বেছে নেওয়া ছয়জনের মধ্যে একজনকে নামাযের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন কারণ এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এক প্রকার অনুমোদন হতে পারে, পরবর্তী খলিফা কে হবেন। নির্বাচনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে চাননি তিনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 398- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে পরবর্তী খলিফা হতে বাধা দিয়ে রাজাদের প্রথা এড়িয়ে গেছেন, যদিও তিনি এর যোগ্য ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র এই কাজের জন্য সেরা পুরুষকেই চেয়েছিলেন তাই ছয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন যারা খলিফার ভূমিকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি ইঙ্গিত করে যে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মানুষের প্রতি কতটা আন্তরিকতা ছিল।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"... শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

উসমান ইবনে আফফানকে খলিফা মনোনীত করা

পরবর্তী খলিফা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর এবং তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি যে ছয়জনকে মনোনীত করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, একটি বৈঠক করেন। আব্দুর রহমান, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে শাসনের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে তিনজন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আয জুবায়ের আলীর পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তালহা উসমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সা'দ আব্দুর রহমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অধিকার ছেড়ে দেন এবং বাকি দুজনকে, অর্থাৎ আলী ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সঙ্গীর পক্ষে তাদের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। দুজনেই চুপ করে থেকে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। তারপর আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাদের কাছ থেকে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কে হবেন পরবর্তী খলিফা। তারা উভয়েই তার পরামর্শে রাজি হন। অবশেষে, আব্দুর রহমান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উসমানের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তাঁর পরে আনুগত্যের অঙ্গীকারকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আলী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এরপর বাকি লোকেরাও তাঁর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে তারা প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছিল এবং জাগতিক কারণে উদ্‌বুদ্ধ ছিল না এবং পরবর্তী খলিফা হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিল।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত

হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর খেলাফত

আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা

ইসলামের প্রথম তিন খলিফা হিসাবে আবু বক্কর, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এর মনোনয়ন সবসময়ই অনেক বিতর্কের বিষয় ছিল। ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিতরা প্রায়শই ইসলামের প্রথম তিন খলিফা হওয়ার অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যাতে দুটি দলকে সত্যের উপর একত্রিত করা যায়: সুন্নি এবং শিয়া। যদিও এটি একটি যোগ্য লক্ষ্য, তবুও গড়পড়তা মুসলমানদের এই আলোচনা বা অন্যান্য অনুরূপ আলোচনা যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, কারণ এই বিষয়গুলি মহান আল্লাহ তায়ালা চান। বিচার দিবসে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 141:

"এটি এমন একটি জাতি যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিকভাবে পরিচালিত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 100:

মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে হিজরতকারী) এবং আনসার (মদিনার অধিবাসী) মধ্যে [ঈমানে] প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সদাচরণে তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় প্রাপ্তি।"

যেহেতু বিচার দিবসে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সেগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে। একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার এবং তার উপর আমল করার পরেই কি তাদের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের অধিকার আছে? যেহেতু কার্যত কেউই এই স্তরে পৌঁছায়নি, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবে, অর্থাত্ যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে।

পরিশেষে, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের ধার্মিক ব্যক্তিত্বকে অপবাদ দেওয়া বোকামি, কারণ তারা পবিত্র কোরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন। এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের মাধ্যমে হেদায়েতের এই দুটি উৎসকে রক্ষা করেছেন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই আমরাই বাণী [কুরআন] নাযিল করেছি এবং আমরাই এর রক্ষক হব।"

অতএব, কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে তবে তারা পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে, যা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ।

রাষ্ট্রদ্রোহ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করলেও উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শেষের দিকে তা স্পষ্ট ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টন করার সময় ধু আল খুওয়াইসিরা নামক একজন মুনাফিক মন্তব্য করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়পরায়ণতা করছেন না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি ন্যায়বিচার না করেন তাহলে কে করবে? উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই সুস্পষ্ট মুনাফিককে হত্যার অনুমতি চাইলেন, তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মন্তব্য করেন যে এই ব্যক্তি অবশেষে একটি বিদ্রোহী দলকে নেতৃত্ব দেবে যারা প্রবেশ করবে এবং প্রস্থান করবে। ইসলামের ঈমান ঠিক যেমন একটি তীরের লক্ষ্য থেকে প্রবেশ করে এবং বের হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 492-493-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এম যে কোন হাদীস যেমন সহীহ বুখারীতে পাওয়া যায়, ৬৯৩৪ নম্বরে এই বিদ্রোহীদের আলোচনা করুন। এই বিদ্রোহীরা উসমান ইবনে আফফানের নেতৃত্বকে এবং পরবর্তীতে আলী বিন আবু তালিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই হাদিসটিও অন্য অনেকের মতোই ইঙ্গিত করে যে, বিদ্রোহীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক ছিল, কিন্তু যে জিনিসটি তাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করেছিল তা ছিল তাদের অজ্ঞতা। তারা মূর্খতার সাথে ইবাদতকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও আমলের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছে যা তাদের জঘন্য পাপের দিকে নিয়ে গেছে। প্রকৃত জ্ঞান থাকলে এমনটা হতো না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে জ্ঞান পাপকে প্রতিরোধ করতে পারে, বিশেষ করে অন্যদের প্রতি, যেমন গার্হস্থ্য নির্যাতন। একজন ব্যক্তি তখনই অন্যের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকে যখন তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণতির ভয় পায়, অর্থাৎ উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতা ও শাস্তি পেতে পারেন। কিন্তু নিজের কর্মের পরিণতির ভয়ের ভিত্তি ও মূল হল জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া কেউ কখনও তাদের কর্মের পরিণতিকে ভয় পায় না। এটি তাদের অজ্ঞতা তাদের পাপ করতে এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করতে উৎসাহিত করবে।

যদি সমাজ মানুষের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য নির্যাতন এবং অন্যান্য অপরাধের ঘটনাগুলি কমাতে চায় তবে তাদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে কারণ শুধুমাত্র ইবাদত এটি ঘটবে না যেমন এটি বিদ্রোহীদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে এবং বড় দুর্দশা সৃষ্টি করতে বাধা দেয়নি। নিরীহ মানুষের জন্য। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

সমান চিকিৎসা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর, তাঁর পুত্র, উবায়দুল্লাহ তিনজনকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিলেন, যাদের তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা তার পিতার হত্যার সাথে জড়িত ছিল: হত্যাকারীর কন্যা, আবু লুলুয়া, জুফায়না (একজন খ্রিস্টান) মানুষ) এবং আল হরমুজান , প্রাক্তন পারস্য সেনাপতি যিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময় ধরা পড়ার পর এবং মদিনায় আনার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায়, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে বন্দী করেছিলেন এবং পরবর্তী খলিফাকে তাঁর সাথে আচরণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও কিছু প্রমাণ রয়েছে যে এই লোকেরা একসাথে ষড়যন্ত্র করেছিল তবুও প্রমাণটি পরিষ্কার হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, হত্যার আগে তাদের একসাথে গোপনে কথা বলতে দেখা গেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা তাদের প্রত্যেকের হাতে আক্রমণে ব্যবহৃত দ্বি-ধারী ছুরিটি দেখা গেছে। উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উবায়দুল্লাহকে শুধুমাত্র প্রাক্তন খলিফার পুত্র বলে তাকে ছেড়ে দেননি। তাই সমান প্রতিশোধের আইনি বিচারের জন্য তিনি তাকে আল হরমুজানের পুত্র আল কামাধবানের কাছে হস্তান্তর করেন কিন্তু আল কামাধবান তাকে ক্ষমা করে দেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 215-216- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন।

যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

একটি সুন্দর উপদেশ - 1

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নলিখিত খুতবাটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 117-118 এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের বলেছিলেন যে তিনি একজন অনুসারী এবং উদ্ভাবক নন।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে।

একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে বলেছিলেন যে তিনি আন্তরিকভাবে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য মেনে চলবেন এবং অনুসরণ করবেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে বলেছিলেন যে তিনি আন্তরিকভাবে পবিত্র কুরআন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য এবং স্বাধীন যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত মেনে চলবেন এবং অনুসরণ করবেন। .

এই প্রক্রিয়াটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একটি ঘটনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআযত বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে চলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি তাকে বিচারের জন্য মামলা করা হয় তবে তিনি কী করবেন? মুআযত রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে তিনি পবিত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি পবিত্র কুরআনে মামলা ও তার বিচার না পান তাহলে কি হবে। তিনি তখন উত্তর দিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন যে, যদি তিনি তার রেওয়ায়েতে মামলা ও তার রায় না পান তাহলে কি হবে। মুআয্দ , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অবশেষে উত্তর দিলেন যে তিনি স্বাধীন যুক্তির অর্থ ব্যবহার করবেন, এমন একটি রায় যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যা তাকে খুশি করেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 140-141-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই একজন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন তখনই তারা স্বাধীন যুক্তি বলে একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যকে তাদের পেশাগত নিরপেক্ষ রায় দিয়ে ইসলামের মধ্যে একটি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করতে দেয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর, এই পণ্ডিত যখন একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হবে। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে বস্তুগত জগত প্রলুব্ধকর। তাদের এতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় এবং এতে তাদের আস্থা রাখা উচিত নয়।

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে তিনি ভয় করেছিলেন যে পৃথিবী তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হয়ে উঠবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ এই

জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি হালাল হলেও, তাদের প্রয়োজনের বাইরে এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটা তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে যেমন অপব্যয় ও অসংযত হওয়া এবং এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা এই জিনিসগুলি যেমন সম্পদ অর্জন করার জন্য বা ছুটিতে যাওয়ার জন্য আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠবে কিন্তু স্বেচ্ছায় রাতের প্রস্তাব দেওয়ার পরামর্শ দিলে তা করতে ব্যর্থ হবে। নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন এর বাইরে চলে যায় তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারণ একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে। আর তাই তাদের জন্য এই হাদীসে প্রদত্ত সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে।

নেতাদের পরামর্শ

উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার তাঁর গভর্নরদেরকে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়ে লিখেছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 118-119-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা অর্থ-সংগ্রাহক নয় বরং মানুষের উপর রাখাল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। যদি তারা অর্থ-সংগ্রাহক হয়ে যায় তবে তারা বিনয়ী, বিশ্বস্ত এবং সৎ হওয়া বন্ধ করবে। তাদের উচিত শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে যা প্রাপ্য ছিল তা নেওয়া এবং আন্তরিকতার সাথে সঠিক জায়গায় স্থাপন করা।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

দৃঢ় অবশিষ্ট

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের কমান্ডারদের কাছে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়ে লিখেছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 120-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সৎ উদ্দেশ্য পরিবর্তন না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন, যা তারা আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতের সময় দেখিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যদি তারা তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে তবে মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্যদের সাথে নিয়ে আসবেন। এবং তিনি যোগ করেন যে তিনি খলিফা হিসাবে তার ভূমিকা পালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এটি অবিচল থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর

দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে।

নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে , দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

একটি সূক্ষ্ম পরামর্শ

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর কর্মচারীদের যারা বাধ্যতামূলক দান সংগ্রহ করেছিলেন তাদের কিছু লিখেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 121-122- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সত্যকে গ্রহণ করেন এবং তাই তাদের অবশ্যই বাধ্যতামূলক দাতব্য গ্রহণ করতে হবে এবং সততার সাথে মানুষকে তাদের অধিকার দিতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের আমানত পূরণ করার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যদের প্রতি অন্যায় না করার জন্যও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে, এতিম বা অমুসলিমদের সাথে যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি করেছিল, কারণ মহান আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করবেন তার প্রতিপক্ষ।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

সুন্দর উপদেশ

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ জনগণকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ১২২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে সমস্ত সাফল্য দান করেছেন, তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার কারণে। . তাই, তাদের পার্থিব বিষয়গুলোকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হতে দেওয়া উচিত নয়।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং

অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

সব জন্য ন্যায়বিচার

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা স্পষ্ট করে দিতেন যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে লোকেরা যদি দেখে যে পবিত্র কুরআন অনুসারে তাকে তালাবদ্ধ করা উচিত, তবে তাদের উচিত তাকে তালাবদ্ধ করা। এমনকি যখন তাকে কিছু পছন্দের জন্য ভুলভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল তখন তিনি সবসময় অভিযোগ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং কোন ক্রোধ বা হতাশার লক্ষণ ছাড়াই তাদের সম্বোধন করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 126 ও 128- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, তিনি একবার তাঁর গভর্নর ছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর সৎ ভাই, ওয়ালিদ ইবনে উকবা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যখন কিছু লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তিনি মদ পান করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাকে তার ভূমিকা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 357-358- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন।

যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

অন্যদের পরামর্শ

উসমান ইবনে আফফান, তার পূর্ববর্তীদের মতো, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সর্বদা সিনিয়র সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার তার গভর্নর এবং কমান্ডারদের বলেছিলেন যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার অনুমতি নিতে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি উর্ধ্বতন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করবেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 127- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

কমান্ডিং ভাল

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে জনগণকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাতেন। তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যাঁদেরকে দুর্বল বলে মনে করা হয়, তাঁদের সমর্থন করবেন যা সঠিক। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 128- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও

তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

অন্ধকার এড়িয়ে চলা

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে নিজের সাথে খুব কঠোর হতেন। তিনি সর্বদা অন্যদের ক্ষতি করা এড়াতেন, কারণ তিনি জানতেন এর পরিণতি গুরুতর। তিনি একবার তার চাকরের উপর রাগান্বিত হয়ে কান মোচড়ালেন। পরের দিন সে ভৃত্যকে ডেকে পাঠায় এবং প্রতিশোধ হিসেবে তার কান পাকানোর জন্য জোর দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 129- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচারের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদের পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে.

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কেউ পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক

হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে যা শেষ পর্যন্ত পরবর্তী জগতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতের আকারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আমানত পূরণ না করে নিজেদের উপর জুলুম করে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের বিশ্বাস। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ। একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার নিপীড়ন এড়ানো, যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 2

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী, উসমান ইবনে আফফান, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ১৩২- এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, লোকদেরকে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ এটি একটি মহান ধন।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরে যা আসে তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, তার মধ্যস্থতায় কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তাদের কবরকে আলোকিত করার জন্য মহান আল্লাহর নূর (পবিত্র কুরআন) থেকে আলো লাভ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। যদি একজন মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তবে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, মানুষকে এই পৃথিবীতে দেখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিচারের দিনে পুনরুত্থিত হতে অন্ধ হওয়ার ভয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এটি অধ্যায় 20 তাহা, 124-126 আয়াতের সাথে সংযুক্ত:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রভু, কেন? তুমি কি আমাকে অন্ধ করে তুলেছ যখন আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার

কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবজ্ঞা করেছ]; আর এভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাবে।"

অতএব, এই পৃথিবীতে হতাশাগ্রস্ত জীবন এবং পরকালে অন্ধ হয়ে পুনরুত্থিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর স্মরণে অবিচল থাকতে হবে।

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একটি মৃত ব্যক্তি।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যতটা সম্ভব সফলভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ ও কার্যকরী উপায় হল কার্যতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর

নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এর জন্য একজনকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

এই পর্যায়গুলি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যার সাথে মহান আল্লাহ আছেন, তাদের কিছুতেই ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি বিজয়ী হতে পারবেন না।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্র বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানের বাণী - 4

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে এই জড় জগতের সাথে উদ্বেগ আধ্যাত্মিক হৃদয়ে অন্ধকার। কিন্তু পরকালের উদ্বেগ আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি আলো। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয় , নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

জিনিষ যেতে দেওয়া

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তাঁর ভুলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং যারা তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিল তাদের ক্ষমা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা

দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

সমালোচনা ও প্রশংসা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যে জিনিসটি ইসলামকে ক্ষুণ্ন করে তারাই যারা অন্যের গঠনমূলক সমালোচনা করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ১৩৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং

মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

ভয়ের জিনিস

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে মুমিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে ভয় করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ১৩৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন তাদের বিশ্বাস হারানোর ভয় পায়।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত অসীম এবং সকল পাপকে অতিক্রম করতে পারে। এবং মহান আল্লাহর অসীম করুণার প্রতি আশা ছেড়ে দেওয়াকে অধ্যায় 12 ইউসুফ, 87 নং আয়াতে অবিশ্বাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"... প্রকৃতপক্ষে, কাফের লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

তথাপি, মুসলমানদের জন্য একটি সত্য বোঝার জন্য এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যথা, একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাসের অর্থ সহ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি, একজন মুসলমান অমুসলিম হিসাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যদি এমন হয় তবে এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় থাকবেন তা উপসংহারে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। এটি তখন ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম পাপের উপর অটল থাকে, বিশেষ করে বড় পাপ, যেমন মদ পান করা এবং তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে কারণ এটি একটি কাজ যা তারা নিঃসন্দেহে পূরণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের আশা আছে বলে বিশ্বাস করে তাদের প্রতারিত করা উচিত নয়। মহান আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশা হিসাবে, কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা, তাঁর রহমতের আশা নয়, এটি নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা যার কোন ওজন বা তাৎপর্য নেই। জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিন ভয় করে যে রেকর্ডিং ফেরেশতারা এমন কিছু লিখে ফেলবে যা বিচারের দিন তাদের অপমানিত করবে।

জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন মুমিন ভয় করে যে শয়তান তাদের ভালো কাজগুলো নষ্ট করে দেবে।

একজনকে অবশ্যই এমন বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলতে হবে যা এর কারণ হতে পারে, যেমন হিংসা। এটি অর্জনের জন্য একজনকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করতে হবে।

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং পাপ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন বিশ্বাসী ভয় করে যে বস্তুগত জগত তাদের পরকাল থেকে দূরে সরিয়ে দেবে যাতে তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়।

যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে যে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না এই দাবি করে যে তারা ছোট থাকে তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে যার অর্থ, তারা ছুটিতে থাকার মতোই এই পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

একটি সুন্দর উপদেশ - 3

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নলিখিত খুতবাটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা একটি ক্ষণস্থায়ী রাজ্যে বাস করছে যা তারা শীঘ্রই ছেড়ে চলে যাবে। অতএব, মৃত্যু আসার আগে তাদের যা করতে হবে তা করতে ত্বরা করতে হবে, কারণ এটি যেকোনো সময় আসতে পারে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর

জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার

জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বস্তুগত জগত খুবই প্রতারণামূলক তাই তারা যেন তাদের বর্তমান জীবনকে প্রতারণা না করে বা প্রধান প্রতারক (শয়তান) মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের প্রতারণা না করে।

শয়তানের প্রধান প্রতারণার মধ্যে একটি হল মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি ইচ্ছুক চিন্তাভাবনা অবলম্বন করতে রাজি করানো, এবং তাদের বিশ্বাস করার জন্য বোকা বানানো যে তারা তাঁর প্রতি আশা রাখে।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম

থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, তার মধ্যস্থতায় কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েও লোকদেরকে যারা মারা গেছেন তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তারা গাফিলতি এড়াতে পারে। পূর্বের লোকেরা মাটি চাষ করেছিল এবং জমি জনবসতি করেছিল

এবং জীবন উপভোগ করেছিল কিন্তু অবশেষে তারা সকলেই তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল।

একজন মুসলমানের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনা করা হলেও, তাদের যে কোন উপায়ে তাদের সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

প্রতিশোধ নেওয়া

একবার এক ব্যক্তি অস্ত্র নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে প্রবেশ করলেন। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, লোকটি উত্তর দেয় যে সে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল কারণ ইয়েমেনে তার গভর্নর তার সাথে অন্যায় করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন তার পরিবর্তে তার কাছে গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত ছিল। যখন লোকটির গোত্র গ্যারান্টি দেয় যে সে আর মদিনায় প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা ছিলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, লোকটিকে যেতে দিন, যদিও তাকে লোকটিকে শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-

খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

সহজ জিনিস মেকিং

এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে রাতের বেলায় ওযুর জন্য পানি আনতেন। যখন তাকে তার চাকরকে জাগিয়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তার জন্য এটি পেতে, তিনি উত্তর দিতেন যে রাতটি তার বিশ্রামের সময়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ১৪৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই দিন ও যুগে অজ্ঞতার কারণে পিতামাতার মতো মানুষের অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলমানের কাছে কোনো অজুহাত নেই কিন্তু সেগুলো পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়া জরুরি। সহীহ বুখারি, 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন যারা অন্যদের প্রতি করুণাময়।

এই করুণার একটি দিক হল একজন মুসলমান অন্যের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলমান অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের শাস্তি হতে পারে। অন্যদের প্রতি করুণাময় হওয়ার জন্য তাদের তাই কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার

রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তারা নিজেরা কষ্ট না করে তা করার উপায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন।

পৃথিবীর সেরা স্থান

মদিনায় পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মসজিদটি প্রাথমিকভাবে ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যার উপরে খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি একটি হালকা ছাদ ছিল। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এর কোনো উন্নতি করেননি। কিন্তু তাঁর খিলাফতকালে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে যেভাবে এটিকে পুনঃনির্মাণ করেন সেভাবে এটিকে বড় করে দেন। এর কাঠের স্তম্ভগুলিও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর খিলাফতকালে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, পরিবর্তন ও বড় ধরনের সংযোজন করেন। তিনি এর দেয়ালগুলি কাটা পাথর ও প্লাস্টার দিয়ে, পাথরের স্তম্ভ এবং সেগুনের ছাদ দিয়েছিলেন। তিনি সুনানে ইবনে মাজা, 738 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে কার্যকর করছিলেন। এতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, এমনকি একটি মসজিদ যত ছোট হোক। চড়ুইয়ের বাসা বা তার চেয়ে ছোট মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 201-202-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার মসজিদ আল হারামের কিছু সাধারণ পরিবর্তনও করেছিলেন। তিনি মসজিদের সাথে সংযুক্ত ইব্রাহিমের স্টেশনটি এখন যেখানে রয়েছে সেখানে স্থানান্তরিত করেন, যাতে মানুষের জন্য আল্লাহর ঘর, কাবাকে প্রদক্ষিণ করা এবং সেখানে প্রার্থনা করা সহজ হয়। তিনি মসজিদের আশেপাশে থাকা কিছু বাড়ি ক্রয় ও ভেঙ্গে মসজিদকে বড় করেন। তিনি মসজিদের চারপাশে নিচু দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন যাতে তাদের উপর বাতি

স্থাপন করা যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 387- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মক্কায় মসজিদ আল হারাম প্রসারিত করেন এবং একটি নিচু প্রাচীর দিয়ে ভূমিকে ঘিরে ফেলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 199-200- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে

আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

প্রশ্নসমুহ

যখনই উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন তিনি অঝোরে কাঁদতেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিতেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, কবর হলো পরকালের প্রথম স্তর। যদি একজন ব্যক্তি এই পর্যায়ে নিরাপদ থাকে তবে এর পরে যা আসবে তা তার চেয়ে সহজ হবে কিন্তু যদি ব্যক্তি এই পর্যায়ে নিরাপদ না থাকে তবে এর পরে যা আসে তার চেয়েও কঠিন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও উল্লেখ করতেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন যে, তিনি কবরের দৃশ্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য দেখেননি। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3120 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন হবে তোমার প্রভু কে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই চলবে না, বরং কর্মের মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে প্রমাণ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর আদেশের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটিই প্রমাণ যা একজন মুসলমানকে তাদের কবরে সমর্থন করবে যখন তারা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি কিছু অমুসলিমও মহান আল্লাহকে বিশ্বাস

করে, তবুও তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা তাদের জীবনে সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেনি। যদি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট হত তাহলে এই অমুসলিমরা এই প্রশ্নে সফল হবেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা সফল হবে না।

পরের প্রশ্ন হবে আপনার ধর্ম কি? একজন মুসলমান যদি এর সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের অবশ্যই ইসলামে বিশ্বাস করতে হবে না বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর সাথে এর শিক্ষাগুলো অর্জন ও তার ওপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করা জড়িত। সুনানে ইবনে মাজা, 224 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দরকারী জ্ঞান অর্জনকে সকল মুসলমানের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

এই হাদিস অনুযায়ী শেষ প্রশ্ন হবে আপনার নবী কে? উল্লেখ্য যে, অতীতের কিছু জাতিও তাদের নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলিম যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কেবল মৌখিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে না, বরং সক্রিয়ভাবে তাঁর ঐতিহ্যগুলি শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাই, অর্থাৎ বাস্তবিকভাবে তাদের অনুসরণ করা। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

মহান আল্লাহর রহমত, ভালবাসা এবং ক্ষমা, যা একজন মুসলিমকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবে শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

একটি সরল জীবন

একজন সফল বণিক হওয়া সত্ত্বেও, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো একটি সরল জীবনযাপন করতেন এবং সর্বদা তাঁর সম্পদ ব্যবহার করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অর্থাত্ মহান আল্লাহর সমর্থনে। অভাবী এবং দরিদ্র। তার ধন-সম্পদ তার হাতে ছিল, হৃদয়ে নয়।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ যেমন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি তাদের হাতে থাকা উচিত তাদের হৃদয় নয়। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল প্রতিটি নিয়ামত নিজের ইচ্ছা নয়, মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, একজনের উচিত তাদের সম্পদ শুধুমাত্র ইসলামের নির্দেশিত এবং সুপারিশকৃত জিনিসের জন্য ব্যয় করার চেষ্টা করা, যেমন একজন ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে। এই মনোভাব একজনকে আশীর্বাদের অর্থের সাথে সংযুক্ত হতে বাধা দেবে, এটি নিশ্চিত করবে যে আশীর্বাদ তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে থাকবে। এটি বোঝার এবং কাজ করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কারণ এটি একজনকে আশীর্বাদের সাথে খুব বেশি সংযুক্ত হতে বাধা দেয়। যেহেতু প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদ চলে যেতে বাধ্য এই মনোভাব একজনকে অত্যধিক দুঃখজনক অর্থে পরিণত হতে বাধা দেবে, যখন এটি শেষ পর্যন্ত হয় তখন শোকাহত এবং হতাশ হয়ে পড়ে। বরকত নিজের হাতে রাখা দুঃখের দিকে নিয়ে যেতে পারে যখন কেউ শেষ পর্যন্ত এটি হারায় তবে এই দুঃখ ইসলামে গ্রহণযোগ্য এবং এটি অধৈর্যতা এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে না, যেমন বিষণ্নতা, যা গুরুতর দুঃখ, শোক, বাড়ে।

উপরন্তু, এই মনোভাব একজনকে আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধা দেয় যা প্রায়শই ঘটে যখন এটি তাদের হাতের পরিবর্তে একজনের হৃদয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সম্পদ মজুদ করা এবং লোভের সাথে আরও বেশি সঞ্চয় করা। এই ধারণাটি 57 অধ্যায়ে আল হাদিদ, আয়াত 23 এ নির্দেশিত হয়েছে:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে নিজের হাতে জিনিস রাখা নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বদা মনে রাখবে যে আশীর্বাদ মহান আল্লাহর জন্য, তাদের নয়। এটি আবার অধৈর্যতা প্রতিরোধ করে যখন কেউ অবশেষে এটি হারায়। এটি আল বাকারাহ, 156 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে:

"যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি দোয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে এটি তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে থাকে যাতে প্রকৃতপক্ষে কেবল মহান আল্লাহর ভালবাসা থাকা উচিত।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রায়শই মসজিদুল হারামের মেঝেতে ঘুমোতে দেখা যেত , তার চারপাশে কোন পাহারাদার ছিল না। তিনি লোকেদের ভাল খাবার দিতেন এবং ভিনেগার এবং জলপাই তেল খেতে বাড়ি ফিরে যেতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 159-160- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য

চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

দোষ গোপন করা

এক অনুষ্ঠানে, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু মুসলমানকে পাপ কর্মে লিপ্ত ধরার জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসার আগেই লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছিলেন যে তার হাতে কোনো মুসলমান ধরা পড়েনি এবং লজ্জিত হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 160-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কর্তব্য বলে উপেক্ষা না করে পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেন। কিন্তু একই সাথে তিনি ভালোবাসতেন যখন জনগণের দোষ-ত্রুটি জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয় যাতে তারা প্রকাশ্যে লজ্জিত না হয়।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। . কেউ যদি এটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তারাই যাদের দোষ-ত্রুটি মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু যে অন্যের দোষ লুকিয়ে রাখে তাকে সমাজ এমন একজন বলে মনে করে যার কোনো স্পষ্ট দোষ নেই।

এই উপদেশের প্রতি দুই ধরনের লোক আছে। প্রথমটি হল তারা যাদের ভুল কাজগুলি ব্যক্তিগত অর্থ, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে না এবং অন্যদের কাছে গর্বিতভাবে তাদের পাপ প্রকাশ করে না। যদি এই ব্যক্তি পিছলে যায় এবং এমন পাপ করে যা অন্যদের কাছে জানা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি অন্যের ক্ষতির কারণ না হওয়া পর্যন্ত পর্দা করা উচিত। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 19:

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ুক [বা প্রচার করা হোক] তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি..."

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4375 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদের ভুলগুলি উপেক্ষা করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল সেই পাপাচারী যে প্রকাশ্যে পাপ করে এবং লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পরোয়া করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়ই অন্যদের কাছে করা পাপের বিষয়ে গর্ব করে। যেহেতু তারা অন্যদেরকে খারাপ কাজ করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে, অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের দোষগুলি প্রকাশ করে, এই হাদিসের বিরোধী নয়। কিংবা এই ব্যক্তিকে এই দুষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ নং 2546-এ পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। সঠিক কারণে।

অন্যদের জন্য উদ্বেগ

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সর্বদা মানুষের বিষয়গুলি সম্পর্কে খোঁজার চেষ্টা করতেন যাতে তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন। এমনকি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসে লোকদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 161- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম।

যদিও একজন মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

নিজেকে উপকৃত করুন

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র রমজান মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে নিবেদিতপ্রাণ উপাসক, মুসাফির ও দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এই কাজটি রমজানের শেষ দশ দিন মসজিদে আধ্যাত্মিক নির্জনতার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণ করতে উত্সাহিত করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ১৮০-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে, তখন নিজেদের উপকার করে, অন্যদের নয়। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়।

উপরন্তু, তারা মারা যাওয়ার পরে লোকেরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে কারণ এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"... বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে নিপীড়কের নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল নিজেরাই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হচ্ছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

ভ্রমণকারীদের জন্য

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট কিছু ঘরকে সরাই হিসাবে মনোনীত করেছিলেন যেখানে অপরিচিত ব্যক্তিরা, যাদের থাকার জায়গা ছিল না, তারা এসে থাকতে পারত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 180-181- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 215 এর সাথে সংযুক্ত:

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কি ব্যয় করবে? বল, "তোমরা যা কিছু কল্যাণকর খরচ কর, তা মুসাফিরের জন্য। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

পথিক হল সেই আগন্তুক যে ভিনদেশে আটকে আছে। আল্লাহ, মহান, মুসলমানদেরকে তাদের যাত্রায় সাহায্য করার জন্য তাদের কিছু সম্পদ তাদের দিতে উৎসাহিত করেন কারণ তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাদের অনেক খরচ হতে পারে। যার কাছে সম্পদ আছে তার উচিত এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের যে কোন উপায়ে সাহায্য করা, যদিও তা তাদের খাদ্য বা পরিবহনের মাধ্যম দিয়ে বা তাদের ভ্রমণের সময় তাদের সাথে ঘটতে পারে এমন কোনো অন্যায় থেকে রক্ষা করা।

উপরন্তু, এটি তাদের বাড়ির বাইরে মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়া যে কেউ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4815 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, জনসাধারণের সামনে মিলিত হওয়ার সময় জনগণকে অবশ্যই সর্বজনীন রাস্তার অধিকার পূরণ করতে হবে।

এই হাদিসে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত তাদের দৃষ্টি নত করা এবং তাদের জন্য হারাম জিনিসের দিকে তাকায় না। আসলে, একজনের উচিত তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের জিহ্বা এবং কানকে একইভাবে রক্ষা করা।

এই হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল, তারা যেন তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এতে বক্তৃতা আকারে ক্ষতি, যেমন অশ্লীল ভাষা এবং গীবত করা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্ষতি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, অন্যকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কথার মাধ্যমে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন শুরু করা এবং অন্যদের কাজে শান্তি দেখানো।

নিজের কথার মাধ্যমে অন্যকে শান্তি প্রসারিত করা এবং তারপর তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা খাঁটি ভণ্ডামি।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি মুসলিমদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার পরামর্শ দেয়। জামে আত তিরমিযী, ২১৭২ নং হাদীসে আলোচিত তিনটি স্তর অনুযায়ী এটি করা উচিত। সর্বোচ্চ স্তর হল আইনের সীমারেখার মধ্যে নিজের কর্মের সাথে এটি করা। এর পরের স্তরটি হল একজনের কথার সাথে এটি করা। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, গোপনে অন্তরের অর্থ দিয়ে করা। এ দায়িত্ব সর্বদা ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী এবং নম্রভাবে পালন করতে হবে। প্রায়শই মুসলমানরা সঠিক জিনিসের উপদেশ দেয় কিন্তু তারা যেমন কঠোরভাবে তা করে, তারা শুধুমাত্র মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সদয় আচরণের সাথে জ্ঞানকে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক যাতে পরামর্শটি অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

উপসংহারে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোকের প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা এবং প্রদর্শন করা।

প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ইসলামী শাসনের অধীনে অমুসলিমদের সম্মানের সাথে আচরণ করা এবং তাদের জীবন, সম্পদ এবং পরিবারগুলিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা নিশ্চিত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ইরাকে তার গভর্নরকে তাদের শান্তি চুক্তির শর্তগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এমনকি জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের উপর আরোপিত কর (জিজিয়া) হ্রাস করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 188-189- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিশরের গভর্নর, আমর ইবন আল আস , আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধার করতে বাধ্য হন যখন রোমানরা মুসলিমদের সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এমন কিছু স্থানীয়দের সাথে এটি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আক্রমণ শুরু করেছিল। তিনি বিজয়ী হওয়ার পর, স্থানীয়রা যারা তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেনি তারা তার কাছে অভিযোগ করে যে রোমান সৈন্যরা তাদের সম্পত্তি দখল করেছে যা এখন মুসলিম সৈন্যদের হাতে রয়েছে। যেহেতু তারা মুসলমানদের সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেনি, আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সমস্ত সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 190- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

সম্পদ উপার্জন

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অনেক জমি বরাদ্দ করেছিলেন যেগুলি হয় অনুর্বর ছিল বা তাদের পূর্ববর্তী মালিকদের দ্বারা পরিত্যক্ত ছিল। বাধ্যতামূলক দান ও ব্যবসার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে জমি চাষ করতে উৎসাহিত করেন, যা জমির রাজস্ব বৃদ্ধি করে এবং সমগ্র সমাজের উপকার করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 193-194- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার

করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

কাজের প্রতি উৎসর্গ

যেহেতু উসমান ইবনে আফফান (রা.) একজন সফল বণিক ছিলেন, তিনি সরকারি কোষাগার থেকে বেতন নেননি, যদিও তিনি এর অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 197- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর প্রতি তার আন্তরিকতাকে তুলে ধরে, কারণ তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের সেবা করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ

থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়ীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য

করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিচার

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ তাদের সাথে ভাগ করে নিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে সচেষ্ট হতেন। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে সরকারি কোষাগার থেকে আত্মীয়দের দেওয়ার জন্য মিথ্যা অভিযোগ তোলে। এটি স্পষ্টতই মিথ্যা ছিল কারণ তিনি প্রায়শই মন্তব্য করতেন যে সরকারী কোষাগার থেকে সম্পদ এইভাবে বন্টন করা তার জন্য বৈধ ছিল না এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও তাকে এমন আচরণ করার অনুমতি দেবেন না। তিনি তা করতে চেয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 205-206- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ

করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ,

2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

শ্রেষ্ঠ মানব

একবার জনৈক ব্যক্তি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি একটি বড় গুনাহ করার পর তাঁর তওবা কবুল করবেন কি না? উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে 40 অধ্যায় গাফির, আয়াত 1-3 পাঠ করলেন:

" হা , মীম। কিতাবের অবতীর্ণ [অর্থাৎ, কোরআন] আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি, প্রাচুর্যের মালিক। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তাঁর কাছেই গন্তব্য।"

তখন তিনি লোকটিকে বললেন ভালো কাজ করতে এবং নিরাশ না হতে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 220-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি এই লোকদের বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ছোটখাট গুনাহগুলো নেক আমলের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় যা অনেক হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 550 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি উপদেশ দেয় যে পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ মুছে ফেলবে। তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহ যতক্ষণ না বড় গুনাহ এড়ানো যায়।

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত ছোট-বড় সব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা এবং যদি সেগুলি ঘটে থাকে তবে মৃত্যুর সময় অজানা থাকায় অবিলম্বে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

নামাজের দ্বিতীয় আযান

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুসরণ করার গুরুত্ব এবং তার সঠিক নির্দেশিত খলিফাদের পথের ওপর জোর দিয়েছেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4607 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে একমত যে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন। সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাদের।

তাঁর খিলাফতকালে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জুমার জামাতে নামাযের জন্য দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করেছিলেন। এটি তাদের জুমার প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার জন্য সময় দেওয়ার অনুমতি দেয় কারণ নতুন-প্রবর্তিত নামাযের আযানটি ঐতিহ্যবাহী একের চেয়ে আগে দেওয়া হয়েছিল, যা খুতবা শুরু হওয়ার ঠিক আগে দেওয়া হয়। এটা সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার পর করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা তার সাথে একমত ছিলেন কারণ এটি চালু করার মধ্যে একটি প্রকৃত সুবিধা ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 227-228- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

আন্তরিকতা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা ভ্রমণের সময় সম্পূর্ণ নামায আদায় করেছিলেন কারণ তিনি নিজেকে মক্কার বাসিন্দা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, ভ্রমণকারী নয়। যদিও, অন্যান্য কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, তবুও তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিলেন, কারণ তারা বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে অপছন্দ করেছিলেন। এমতাবস্থায় ভ্রমণের সময় নামায কম করা ওয়াজিব নয়, কিছু আলেমদের মতে এটি কেবল বাঞ্ছনীয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 224-225- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের আচরণ তাদের নেতার প্রতি আন্তরিকতা এবং ভাল এবং বৈধ বিষয়গুলিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব উভয়ই দেখিয়েছিল।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

ঐক্য

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা ভ্রমণের সময় সম্পূর্ণ নামায আদায় করেছিলেন কারণ তিনি নিজেকে মক্কার বাসিন্দা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, ভ্রমণকারী নয়। যদিও, অন্যান্য কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, তবুও তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিলেন, কারণ তারা বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে অপছন্দ করেছিলেন। এমতাবস্থায় ভ্রমণের সময় নামায কম করা ওয়াজিব নয়, কিছু আলেমদের মতে এটি কেবল বাঞ্ছনীয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 224-225- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের আচরণ তাদের নেতার প্রতি আন্তরিকতা এবং ভাল এবং বৈধ বিষয়গুলিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব উভয়ই দেখিয়েছিল।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না

দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না । কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের

পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন

করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না

করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

মিলন

দুটি মুসলিম বাহিনী, একটি সিরিয়ার এবং অন্যটি ইরাক থেকে, একবার তাদের সামগ্রিক নেতা কে হবে তা নিয়ে বিতর্কে পড়েছিল। এই বিরোধ প্রায় সহিংসতায় পরিণত হয়েছিল কিন্তু সাহাবীগণ, যেমন হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা উপস্থিত ছিলেন উভয় পক্ষের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটিয়ে রক্তপাত রোধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 255-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 114 শ্লোকের সাথে সংযুক্ত:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্যদের সাথে কথা বলার সময় মানুষের কীভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তারা নিজের এবং অন্যদের জন্য উপকৃত হয়। প্রথমটি হল যখন মুসলমানরা একত্রিত হয় তখন তাদের আলোচনা করা উচিত কিভাবে অন্যদের উপকার করা যায় যা সম্পদ এবং শারীরিক সাহায্যের আকারে দাতব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি একজন মুসলিম একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় না থাকে তবে এটি তাদের সাহায্য করার সমান পুরস্কার অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ

মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6800, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যকে ভাল কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে যেন সে নিজেই ভাল কাজ করেছে। যদি কেউ অসুবিধায় কাউকে সাহায্য করতে না পারে বা অন্যকে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে না পারে তবে তারা অন্তত অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ফেরেশতাদের প্রার্থনাকারীর জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সুনান আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতা দলটিকে অভাবী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা তাদের মানসিক সহায়তা প্রদান করে। এটি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে এবং তাদের কষ্ট মোকাবেলা করার সময় তাদের শক্তির একটি নতুন মোড প্রদান করে। লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে যখন কেউ একজন অভাবী ব্যক্তির পরিস্থিতি উল্লেখ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করা উচিত। সময় কাটানোর জন্য এবং তাদের উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত করা কখনই উচিত নয়।

আশীর্বাদ লাভের দ্বিতীয় উপায় হল যখন কেউ বৈধ কোন বিষয়ে কথা বলে যা ইহকাল বা পরকালে কারো উপকারে আসে। এই দিকটির মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো কাজ করার এবং মন্দ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া।

এই আয়াতে উল্লিখিত তৃতীয় দিকটি হল একটি গঠনমূলক মানসিকতার সাথে অন্যদের সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ধ্বংসাত্মক মানসিকতার অধিকারী করার পরিবর্তে ইতিবাচক উপায়ে একত্রিত করে যা সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। যদি একজন ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসার উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তারা ন্যূনতম যা করতে পারে তা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। এমনকি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে এটি একটি ভাল কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি সহীহ বুখারী, 2518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলমানের মধ্যে মিলন স্বেচ্ছায় নামায ও রোযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল এই ধার্মিক মনোভাবের ফল যেমন স্কুল, হাসপাতাল ও মসজিদ নির্মাণ।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজন মুসলমান তখনই এই আয়াতে উল্লিখিত মহান পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে। প্রতিটি ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নয় তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অকৃত্রিম মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সত্য নির্দেশনা মেনে চলুন

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একজন সেনাপতি, যার নাম ইবনে আমির, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেছিলেন, তিনি অনেক বিজয় লাভ করেছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে তিনি ইরানের খোরাসান থেকে একজন তীর্থযাত্রীর রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং জিয়ারত (ওমরা) করতে চলে যান। যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি যা করেছিলেন তা শুনেছিলেন, তিনি তাঁর সমালোচনা করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে মক্কার পবিত্র ভূমির সীমান্তে একজন তীর্থযাত্রীর অবস্থায় তাঁর প্রবেশ করা উচিত ছিল, কারণ এটি ছিল পবিত্র ভূমির দ্বারা নির্ধারিত স্বাভাবিক অনুশীলন। নবী মুহাম্মদ সা. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 260-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য মেনে চলার এবং অপ্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোকাবিলা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর, মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বসবাসকারী কিছু অমুসলিম বিদ্রোহ করে এবং মুসলমানদের সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে। উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, দ্রুত তাদের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন এবং তাদের বিদ্রোহের কাজগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। তারা মুসলমানদের দ্বারা পরাভূত হওয়ার পরে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শাস্তি দেননি এবং পরিবর্তে তাদের সাথে শান্তিচুক্তি পুনর্বিবেচনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ২৬১-২৬২- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

সাইপ্রাস অভিযান

ড্রপ এবং একটি মহাসাগর

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন রোমানরা হোমস শহর আক্রমণ করবে, কারণ এটি তাদের অঞ্চলের কাছাকাছি ছিল। তিনি খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেন, হোমসকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্রপথে সাইপ্রাসে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দেওয়ার জন্য, কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমুদ্র ভ্রমণের ধারণাটিকে অপছন্দ করেন। উসমান যখন খলিফা হন, তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে সৈন্যদের তার সাথে যেতে বাধ্য করবেন না এবং পরিবর্তে তাদের বিকল্পটি অফার করবেন, কারণ সে সময় অনেক লোক সমুদ্রপথে ভ্রমণ পছন্দ করত না। একটি বিশাল বাহিনী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর অভিযানে যোগ দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৫- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও এই সৈন্যরা এই অভিযানে তার সাথে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিল কারণ তাদের মনোযোগ ছিল পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং বস্তুগত জগতের বিলাসিতা উপভোগ করা নয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের

প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

উদাহরণের সাহায্যে পরিচালনা

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসকে নৌবাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি সমুদ্রপথে অন্তত পঞ্চাশটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তিনি তার সৈন্যদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং শত্রু অঞ্চলে স্কাউট হিসাবে একজন সৈনিক পাঠানোর পরিবর্তে তিনি নিজে যেতেন। রোমান অঞ্চলে তার একটি স্কাউটিং মিশনে তাকে আবিষ্কার করা হয়েছিল, আক্রমণ করা হয়েছিল এবং শহীদ করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 277-278- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি যে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তার মধ্যে একটি উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব

ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

জয় কিভাবে

সাইপ্রাসে অভিযান ও বিজয়ের সময়, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধবন্দীদের দেখেছিলেন এবং কাঁদতেন। যখন তাকে তার কান্নাকাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে এই লোকদের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ ছিল কিন্তু যখন তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করতে থাকে তখন তারা অপমানিত ও অপদস্থ হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 280-281- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্র বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

উত্তর আফ্রিকা অভিযান

অবিচলতা

উত্তর আফ্রিকা অভিযানের সময়, একটি মুসলিম সেনাবাহিনী তার আকারের 8-10 গুণ একটি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। যখন মুসলিম সৈন্যরা শত্রু সৈন্যদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ছিল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রু রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে রাজা নিহত হন। শত্রু সেনারা এটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকেই পালিয়ে যায়। এটি মুসলমানদের তাদের পরাস্ত করতে এবং বিজয় অর্জন করতে দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 292-293- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের অভ্যন্তরীণ শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে

আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

লোভ মুক্ত

আর্মেনিয়া বিজয়ের সময় ইরাক থেকে একটি মুসলিম সেনাবাহিনীকে সিরিয়া থেকে আসা একটি মুসলিম সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইরাকি বাহিনী আসার আগেই সিরিয়ার সেনাবাহিনী আর্মেনিয়া জয় করে ফেলেছে। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর নেতা উসমান ইবনে আফফানকে লিখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ইরাকি সৈন্যদের যুদ্ধের লুটের অংশ বরাদ্দ করা উচিত কিনা তা জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের উচিত, যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই বিজয়ের সময় তাদের সাহায্য করা। সিরিয়ার সৈন্যদের এ সম্পর্কে বলা হয়েছিল এবং তারা উত্তর দিয়েছিল যে তারা খলিফার কথা শুনবে এবং মান্য করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৩০৮-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুর রহমান ইবনে রাবিয়াহ (রহঃ) আল বাবের গভর্নর নিযুক্ত হন। আল বাবের রাজা মুসলিম গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং তাই যখন চীনের রাজা তাকে একটি অমূল্য রুবি সহ কিছু উপহার পাঠান, তখন তিনি তা গভর্নর আবদুর রহমানকে উপহার দেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন । তিনি পরিবর্তে এটি আল বাবের রাজাকে ফিরিয়ে দেন, কারণ উপহারটি তার জন্য ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফ্ফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৩১১-৩১২ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানরা ধন-সম্পদ অর্জনে নয়, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেবা করতে আগ্রহী ছিল।

কপটতার একটি দিক হল লোভ। তাদের চরম লোভ তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি রাখে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যরা দান করাকে তারা অপছন্দ করে কারণ তাদের লোভ অন্যদের কাছে প্রকাশ পায়। তারা মানুষকে দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখে কারণ তারা সমাজে অন্যকে উদার হিসাবে লেবেল করা অপছন্দ করে। তাই তারা সর্বদা লোকেদের দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যেমন খারাপ কারণে দাতব্য সংস্থাকে কন আর্টিস্ট হিসাবে লেবেল করা। এই লোকদের উপেক্ষা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন যা সহীহ বুখারির 1 নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। সুতরাং তাদের দান করা সম্পদ গরীবদের কাছে না পৌঁছালেও যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করে। সুপরিচিত দাতব্য তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী তাদের পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 67:

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের। তারা অন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত বন্ধ করে..."

ধর্মীয় স্বাধীনতা

এটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য যে, যদিও ইসলামি সাম্রাজ্যের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও ইতিহাসের অন্য সব সাম্রাজ্যের বিপরীতে ভূমি বা ক্ষমতা লাভ করা লক্ষ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী ভূখন্ডের জনগণকে ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ দেওয়া, যা বিদেশী শক্তি দ্বারা বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যেহেতু ইসলাম একটি বিশ্বাস যা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, তাই তরবারির মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো, উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর শাসনাধীন সকল লোকের ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা ছিল তা নিশ্চিত করেছিলেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নেতাদের এবং সৈন্যদের সদ্য বিজিত ভূমির নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান করতে এবং পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা একই অধিকার দিয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে সকল মুসলমানের কাছে ঋণী, যদিও তারা সম্প্রতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা হয় এবং এর মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলামের ব্যাপক

উপকারিতা ও সত্যতা প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করে। লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, মুসলমানরা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার কারণে নাগরিকদের আনুগত্য অর্জন করেছিল।

ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনো ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারকারী অন্য কোনো ধর্মই তার কর্তৃত্বাধীন অন্য ধর্মকে প্রকাশ্যে ও নিপীড়নের ভয় ছাড়াই তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়নি।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, দরিদ্র ও অক্ষমদের কর (জিজিয়া) প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে থাকেন, যা ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী অমুসলিমরা সরকারকে প্রদান করবে। রাষ্ট্র যখন ইসলামী অঞ্চলে বসবাসরত অমুসলিমদের মৌলিক জনসেবা প্রদান ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় তখনও এই কর নেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু বক্করের খিলাফতের সময়, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, যখন মুসলিম বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায় পিছু হটতে বাধ্য হয়, যা শেষ পর্যন্ত ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায় , কর। সিরিয়ার অমুসলিমদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া এলাকাগুলো যেগুলো মুসলিমরা প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, সেগুলো জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পদ ফেরত পাওয়ার সময় লোকেরা মন্তব্য করেছিল যে তারা আশা করেছিল যে মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে এবং তাদের কাছে ফিরে আসবে কারণ মুসলমানরা তাদের সাথে রোমানদের চেয়ে ভাল আচরণ করেছিল। রোমানরা তাদের কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে যেত এবং তাদের কিছুই না রেখে চলে যেত, অথচ, যুদ্ধের সময়ও মুসলমানরা তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দিত। অমুসলিমরা যখন বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে তাদের ভূমি রক্ষায় অংশগ্রহণ করত তখনও কর নেওয়া হত না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 204-205 এবং 444-446- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন সংকলন

ইয়ামামার যুদ্ধের পর , যার ফলে অনেক মুসলিম হতাহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছিলেন, উমর ইবনে খাত্তাব আবু বক্করকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করতে এই ভয়ে যে আয়াতগুলি হারিয়ে যেতে পারে যদি পবিত্র কুরআনের মুখস্থকারীরা মারা যেতে থাকে বা যুদ্ধে শহীদ হতে থাকে। এর আগে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো কোনো একটি বইয়ে ছিল না, বরং সেগুলো হয় মুখস্থ করা হতো বা বিভিন্ন বস্তুর ওপর লেখা হতো, যেমন পাথর, যা বিভিন্ন মানুষের দখলে ছিল। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি এমন কিছু করতে চাননি যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন উমর অটল ছিলেন, তখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এটিই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আবু বক্কর জায়েদ বিন সাবিতকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কপিটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়, যতক্ষণ না তিনি মারা যান, তারপর তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং অবশেষে তাঁর কন্যা এবং মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে সন্তুষ্ট সহীহ বুখারীর ৭১৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত পর্যন্ত, মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআন পাঠ করা জায়েয ছিল বিভিন্ন উপভাষা অনুযায়ী। সাতটি ভিন্ন উপভাষায় প্রকাশিত। এটি এর আবৃত্তিতে নমনীয়তার জন্য অনুমতি দেয়। কিন্তু আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের সময় হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান

রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া ও ইরাক থেকে আগত সৈন্যদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এই পার্থক্যগুলি বিশেষ করে অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তারা আপত্তি করতে পারে যে তেলাওয়াতের পদ্ধতির সাথে তারা পরিচিত ছিল না। তাই তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে আসেন এবং মুসলিম জাতিকে একটি তেলাওয়াতে জড়ো করার অনুরোধ করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার পর এতে সম্মত হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের কেউই তার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি পবিত্র কুরআনের ভৌত কপি পাঠালেন যা মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিল; এই সংস্করণের কপি তৈরি; এবং তাদেরকে সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে প্রেরণ করেন এবং তাদের তিলাওয়াতের পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন, যা ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর গোত্র কুরাইশদের পাঠের পদ্ধতি। এটি সহীহ বুখারী, 4987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পবিত্র কুরআন পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমানদের অবশ্যই সর্বদা পবিত্র কুরআনকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করে তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং

শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

উপরন্তু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকাণ্ড ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে

নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

বিশ্বস্ত হওয়া

উসমান ইবনে আফফান যখনই মদীনা থেকে চলে যেতেন তখনই তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে নিযুক্ত করতেন। তিনি প্রায়ই যায়েদ ইবনে সাবিতকে দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা

যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

অন্যদের মনিটরিং

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সবচেয়ে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং সক্ষম ব্যক্তিদের নেতৃত্বের পদে নিয়োগ করতেন। কিন্তু তিনি তাদের স্বাধীন রাজত্ব দিতেন না। তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের মাধ্যমে ক্রমাগত তাদের পর্যবেক্ষণ করতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তীর্থযাত্রার মৌসুম ব্যবহার করতেন, যেখানে সমস্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের লোকেরা পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ) করতে মক্কায় আসত। তিনি এটি সম্পাদনও করতেন এবং জনগণকে তাদের গভর্নরদের সাথে তাদের যে কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উত্সাহিত করতে সময় ব্যয় করতেন। তিনি তীর্থযাত্রার মরসুমে তার কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করতেন যারা সেখানেও উপস্থিত ছিলেন, তাদের দায়িত্ব এবং তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা লোকদের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

উসমান, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, অনেক পরিদর্শক ছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল গভর্নরদের তত্ত্বাবধান করা এবং গভর্নররা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করা। তারা, পরিবর্তে, তাদের দায়িত্ব সর্বোচ্চ মানদণ্ডে পূর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক সহায়তা ছিল।

তিনি নিয়মিত বিভিন্ন এলাকা থেকে এলোমেলো নাগরিকদের তাদের গভর্নর এবং জনগণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পাঠাতেন।

জনগণের বিষয়ে তার গভর্নরদের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদনের জন্য অনুরোধ করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৭- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর আচার-আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার আদায় করাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

সঠিকভাবে নেতৃত্ব

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বিভিন্ন অঞ্চলের কাছে একটি জনসাধারণের চিঠি লিখে তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপদেশ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ৩৬৮-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উল্লেখ করেছেন যে তিনি নিয়মিত তাঁর গভর্নরদের পরীক্ষা করতেন এবং প্রতি তীর্থযাত্রার মরসুমে তাদের সাথে বৈঠক করতেন। তিনি জনসাধারণকে ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার আহ্বান জানান।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন

মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বা তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে যে সমস্ত অভিযোগ তাঁর কাছে আনা হয়েছিল তা তিনি খতিয়ে দেখবেন। তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করেন যে জনগণের অধিকারের আগে তার বা তার পরিবারের কোনো অধিকার নেই।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও অনুরোধ করেছিলেন যার কাছে অভিযোগ ছিল স্কোর মীমাংসা করার জন্য বা তাদের ক্ষমা করার জন্য, কারণ মহান আল্লাহ এর প্রতিদান দেন।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক

মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর খিলাফতের সময় তাঁর আত্মীয়দের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করা থেকে বিরত ছিলেন, কারণ তিনি পক্ষপাতিত্বের বাহ্যিক লক্ষণগুলিকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, কিছু আত্মীয়কে নিয়োগ করেছিলেন যারা ইতিমধ্যেই তাঁর খিলাফতের আগে নিযুক্ত ছিলেন, যেমন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আমর ইবনে আল আস , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র তার পূর্বসূরিদের মতই এর যোগ্যদেরই নিয়োগ করেছিলেন। উভয় পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আত্মীয়-স্বজন এবং অ-আত্মীয়দের নেতৃত্বের ভূমিকায় নিযুক্ত করেছেন। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রতিটি নিয়োগ ন্যায়সঙ্গত এবং একজন মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক থাকে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এমন সব সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফার মনোভাব ছিল।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য

কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের

ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহ ও অশান্তি

জাতির জন্য ভয়

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শেষের দিকে যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রধান জিনিস ছিল পার্থিব জিনিসের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা। এর আগে, সাহাবায়ে কেরামের মতো সাধারণ জনসাধারণও আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতির দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগী ছিল তাই তারা পার্থিব বিলাসিতাকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু যখন বিজয় ও বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের কাছে পার্থিব বরকত উন্মুক্ত হতে শুরু করে, তখন তাদের মনোযোগ জড়জগত উপভোগ করার দিকে পড়ে এবং তাই তারা পরকালের প্রস্তুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেবলমাত্র সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের কিছু আন্তরিক অনুসারী, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন, পরকালের জন্য প্রস্তুতিতে অটল ছিলেন। পরকালের প্রতি মনোনিবেশ করা একজনকে ক্রমাগত চিন্তা করতে এবং শেষ বিচারের দিন তাদের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত করতে বাধ্য করে যা একজনকে ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে ঐক্যের দিকে পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন কেউ বস্তুজগত উপভোগ করার দিকে মনোনিবেশ করে, তখন তারা তাদের দায়বদ্ধতা ভুলে যায়। তারপর তারা সীমাবদ্ধতা ছাড়া পার্থিব বিলাসিতা পেতে এবং উপভোগ করতে উত্সাহিত হয়। এটি একজনের মধ্যে লোভ এবং হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে এবং এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়।

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না।

পরিবর্তে তিনি ভয় করেছিলেন যে পৃথিবী তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হয়ে উঠবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি হালাল হলেও, তাদের প্রয়োজনের বাইরে এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটা তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে যেমন অপব্যয় ও অসংযত হওয়া এবং এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা এই জিনিসগুলি যেমন সম্পদ অর্জন করার জন্য বা ছুটিতে যাওয়ার জন্য আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠবে কিন্তু স্বেচ্ছায় রাতের প্রস্তাব দেওয়ার পরামর্শ দিলে তা করতে ব্যর্থ হবে। নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন এর বাইরে চলে যায় তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারণ একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে। আর তাই তাদের জন্য এই হাদীসে প্রদত্ত সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে।

রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে সতর্কতা

যখন উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, প্রকাশ্যে পাপ এবং খারাপ আচরণের বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে শুরু করেন, তিনি নিম্নলিখিত খুতবা দেন, যা ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরায়নে লিপিবদ্ধ হয়েছে । পৃষ্ঠা 454-455।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি সমাজে ক্রমবর্ধমান অন্যায়ের খবর শুনছেন। রাষ্ট্রদ্রোহের দ্বার উন্মোচন বা সূচনাকারী তিনিই প্রথম হতে যাচ্ছেন না। সে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল এবং নিজেকে সংযত করছিল। আর যে তার অনুসরণ করবে, তিনি তাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন এবং যে তার অনুসরণ করবে না, তাদের মনে রাখতে হবে যে, বিচারের দিন প্রত্যেক আত্মাকে জবাবদিহির জন্য সামনে আনা হবে। তিনি উপসংহারে বলেছেন, যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, সে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু যে পার্থিব লাভ কামনা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে মুছে ফেলে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও লোকেদের এড়িয়ে চলা এবং এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পেতে চাইলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

একটি সুন্দর উপদেশ - 4

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নলিখিত খুতবাটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 455-456 এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ পার্থিব আশীর্বাদ দান করেছেন যাতে তারা তাদের মাধ্যমে পরকালে পুরস্কার পেতে পারে। তিনি তাদের মঞ্জুর করেননি যাতে লোকেরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর

প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যেখানে আখেরাত চিরকাল স্থায়ী হবে, তাই তাদের চিরন্তন

পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে সাময়িক পার্থিব আশীর্বাদের দ্বারা প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

এই বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর জন্য এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি অবলম্বন করতে হবে।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন

করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যেখানে আখেরাত চিরকাল স্থায়ী হবে, তাই তাদের চিরন্তন পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে সাময়িক পার্থিব আশীর্বাদের দ্বারা প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এরপর তিনি মানুষকে মহান আল্লাহকে ভয় করতে এবং মুসলমানদের মূল অংশকে মেনে চলতে এবং দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন। তারপর তিনি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 103-104 পাঠ করলেন:

“আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর - যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের অন্তরকে একত্রিত করলেন এবং তাঁর

অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তুমি ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, আর তিনি তোমাকে তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হতে পার। আর তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি জাতি সৃষ্টি হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম।"

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন অথচ মুসলমানরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন । অথচ বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির

ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয় এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। তিনি সতর্ক করেছিলেন। যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় করতেন না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের পিছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয় , যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেটি পরামর্শ দেয় যে মুসলমানদের একটি শরীরের মতো আচরণ করা উচিত যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয় তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব

বিষয়ে তাদের সহ-মুসলমানদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং রোধ করবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, নম্বর 4681। এই প্রতিযোগিতা হল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাহলে তাদের এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন ও সঞ্চয় করার চেষ্টার চেয়ে আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

অজ্ঞতা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শেষ দিকে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার আরেকটি বড় কারণ ছিল অজ্ঞতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু আয়াত বা হাদিস শিখতেন, যারা আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, সাহাবী ছিলেন না বা সরাসরি তাদের কাছ থেকে শিখেননি, তাদের অর্থ না বুঝেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু আয়াত বা হাদিস শিখতেন। সঠিকভাবে এবং তারপর মিথ্যা থেকে সত্যের বিচার করার জন্য নিজেদেরকে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে মনে করবে। এটি তাদের পণ্ডিতদের থেকে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছিল এবং এমনকি যুক্তি ছাড়াই অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পরিচালিত করেছিল। উপরন্তু, ইসলামের প্রসার দ্রুতগতিতে হওয়ায় নতুন মুসলমানদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে চলা ইসলামী সরকারের জন্য খুবই কঠিন ছিল এবং ফলস্বরূপ ব্যাপক অজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং পাপ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঈমানের দুর্বলতা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শেষ দিকে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার আরেকটি বড় কারণ ছিল ঈমানের দুর্বলতা। সাহাবায়ে কেরামের যুগে সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অনেকেই, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কারণ এটি ছিল ফ্যাশনেবল জিনিস। তারা প্রমাণ ও বোঝার ভিত্তিতে তা গ্রহণ করেনি। বরং অন্যের অন্ধ অনুকরণে তারা তা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অনেকেই আবু বক্কর (রা) এর খিলাফতকালে ধর্মত্যাগ করেছিলেন। যারা তওবা করেছে এবং যারা ধর্মত্যাগী যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তে, তারা ইসলামের বাহ্যিক উপাদানগুলিকে পরিপূর্ণ করেছিল এবং সেগুলিকে কয়েকটি অনুশীলন হিসাবে বিবেচনা করেছিল যেগুলি পূরণ করা দরকার ছিল কিন্তু তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কীভাবে একজন ধার্মিক মুসলিম হিসাবে জীবনযাপন করা যায় তা শেখার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এই কারণে তারা তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে পবিত্র কুরআনে শেখানো ভাল গুণাবলী এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে বিনিময় করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা সমস্তই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং ক্ষতির প্রতিরোধ করে। মানুষ। যেহেতু তাদের ঈমান দুর্বল ছিল, তারা পরকালে তাদের জবাবদিহিতা মনে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা সহজেই ইসলামের শত্রুদের দ্বারা বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে বড় বাধা হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, যেমন নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে ভয় করা, মানুষের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপরে রাখা, এর জন্য চেষ্টা না করে ক্ষমার আশা করা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈশিষ্ট্য ঈমানের দূর্বলতার

সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল যে এটি একজনকে পাপ করতে দেয়, যেমন ফরজ কর্তব্যে অবহেলা করা। ঈমানের দুর্বলতার মূল কারণ ইসলামের অজ্ঞতা।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সময়ের সাথে সাথে তারা অবশেষে বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছে যাবে যা এত শক্তিশালী যে এটি একজন ব্যক্তিকে সমস্ত পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দায়িত্ব পালন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে এই জ্ঞান পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যে শিক্ষাগুলো আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং যারা মহান আল্লাহর অবাধ্য তাদের জন্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে। এটি একজন মুসলমানের হৃদয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের আশা তৈরি করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে একটি টান এবং ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির উপর প্রতিফলন করে কেউ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। সঠিকভাবে করা হলে এটি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি

তারা সত্যই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, এমন একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। যদি একাধিক ঈশ্বর থাকত, তবে প্রত্যেক দেবতাই তাদের ইচ্ছানুযায়ী রাত ও দিন ঘটতে চাইত । এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

আরেকটি জিনিস যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে তা হল সৎকর্মে অবিচল থাকা এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা। বিশ্বাস যেহেতু কর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশ্বাস তাই পাপ সংঘটিত হলে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন ভাল কাজ করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আন নাসাই, 5662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমান যখন মদ পান করে তখন সে বিশ্বাসী হয় না।

সংস্কৃতি বনাম ধর্ম

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শেষের দিকে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার আরেকটি প্রধান কারণ ছিল সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের অভাব। ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে যা ইসলামিক জ্ঞানের সন্ধান এবং কাজ করার ইচ্ছার অভাব এবং নতুন মুসলমানদের সংখ্যার কারণে যাদের ইসলামিক জ্ঞানের সীমিত প্রবেশাধিকার ছিল, এই নতুন মুসলমানরা তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে একত্রিত করেছিল। এটি তাদের ইসলামী শিক্ষার সারমর্মের সাথে আপস করতে বাধ্য করেছিল, যার ফলে আল্লাহ, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং মানুষের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছিল।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের

আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিয়েছিলেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চাকে অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

অন্ধ অনুকরণ

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শেষ দিকে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার আরেকটি বড় কারণ ছিল অন্ধ অনুকরণ। সময়ের সাথে সাথে সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের অনেকেই ইসলামী জ্ঞান শেখার ও আমল করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেননি এবং বরং তাদের আগে যারা এসেছেন তাদের অন্ধ অনুকরণ করেছেন। যারা সাহাবায়ে কেরামকে অনুকরণ করতেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা গোমরাহী থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন কিন্তু তাদের অনেকেই দুর্বল ঈমানের অধিকারী তাদের অজ্ঞ বুজুর্গদের অন্ধ অনুকরণ করতে শুরু করেছিলেন। ফলে সমাজে অজ্ঞতা ও বিপথগামীতা বৃদ্ধি পায়। যখন এসব বেড়ে যায় তখন মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং মানুষের ক্ষতি বাড়ে।

অন্ধ অনুকরণ পরিহার করতে হবে, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি। বরং তারা ইসলামী জ্ঞান শিখেছে এবং তার উপর আমল করেছে যার ফলে তারা উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ; আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে..."

সুনানে ইবনে মাজায় পাওয়া একটি হাদিস, 4049 নম্বর, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের পরিবার, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে ছাড়িয়ে যায় এবং মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও সত্যই। তার প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্ব স্বীকৃতি . এটি আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে একজন সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে যাকে তারা চিনতে পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই কারণ যে মুসলমানরা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পূর্ণ করবে। এবং এটি সেই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তাদের জীবনের সমস্ত অসুবিধাকে জয় করে। যদি তাদের কাছে এটি না থাকে তবে তারা পুরস্কার অর্জন ছাড়াই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল উভয় জগতেই আরও অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পথ দেখাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল অসুবিধার সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে বা বিপরীতে।

দুবার বোকা বানানো হয়নি

তাঁর খিলাফতের সময়, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যারা ধর্মত্যাগ থেকে অনুতপ্ত হয়েছিল তাদেরকে মুসলিম অভিযানে যোগদানের অনুমতি দেননি, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তারা আবার ধর্মত্যাগে প্রলুব্ধ হতে পারে। বিদেশী ভূমিতে পরাশক্তির সাথে জড়িত মুসলিম সৈন্যদের জন্য এটি বিপর্যয়কর হবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যারা ধর্মত্যাগ থেকে তওবা করেছিল তারা ইসলামের উপর অটল ছিল, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে মুসলিম অভিযানে যোগদানের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাদেরকে নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করেননি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 121 এবং 157-158- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তাঁর খিলাফতের সময়, উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অনুভব করেছিলেন যথেষ্ট সময় (এক দশকেরও বেশি) যেখানে প্রাক্তন মুরতাদরা ইসলামের উপর অটল ছিল। ফলে তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাদের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ মওকুফ করে দেন এবং এমনকি তিনি তাদের কয়েকজনকে নেতা নিযুক্ত করেন। যদিও তার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক ছিল এবং প্রাক্তন ধর্মত্যাগীদের সাথে পুনর্মিলন করার একটি পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়েছিল, কিছু ক্ষেত্রে এটি বিপরীতমুখী হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাথে জড়িত হয়েছিল যার ফলে উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৪- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6133 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশনে পড়ে না।

এর অর্থ হল একজন বিশ্বাসী কোনো কিছু বা কারো দ্বারা দুবার বোকা হয় না। এর মধ্যে গুনাহ করা অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন পাপ করার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু যখন তারা সেগুলি করে তখন তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না এবং বরং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিখে এবং পরিবর্তন করে।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না যার ফলে তাদের দ্বারা অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তারা কেউ দ্বারা প্রতারিত হয় তবে তাদের উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি তাদের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

তবে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের সাবধানতার সাথে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত যাতে তারা আবার বোকা না হয় তা নিশ্চিত করে। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে কারো প্রতি অন্যায় করার পরে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

এই হাদিসটি একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান

থেকে শিক্ষা নেন যাতে তারা আরও ভাল পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আদেশ পালন করে, বিরত থেকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তির মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী।

অন্তর্দৃষ্টি

উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার তাঁর সেনাপতিদের কাছে নিম্নলিখিত শব্দগুলি লিখেছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 468-469-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে স্বার্থপরতা ব্যাপক হয়ে উঠছে।

স্বার্থপরতার মূল লোভ।

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে লোভের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এটি একজনকে বাধ্যতামূলক দাতব্য বন্ধ করে দিতে পারে যা কেবল উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

“আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

যদি কারো লোভ তাদের স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করতে বাধা দেয় তবে এটি বেআইনি নাও হতে পারে তবে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সহজ কথায়, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে স্বার্থপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করছে এবং এর কারণ হচ্ছে জড় জগতের প্রতি ভালোবাসা এবং কামনা-বাসনা।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের

নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে স্বার্থপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করছে এবং এর কারণ হচ্ছে জড় জগতের প্রতি ভালোবাসা এবং কামনা-বাসনা।

এই মনোভাব একজনকে তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণের জন্য ইসলামী জ্ঞানের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে পারে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক

করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান হল মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকৃত হবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সমস্ত কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। ফল গাছের মতো অন্যদের উপকার করার জন্য কিছু গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের মতো অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র

অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর কাজ করাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। এটা নিছকই বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

সহনশীলতা

উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন এবং এটি কিছু লোক দ্বারা শোষিত হয়েছিল যারা তাঁর এবং মুসলমানদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। একবার, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট প্রমাণ সহ সমস্যা সৃষ্টিকারীদের সমালোচনাকে খণ্ডন করেছিলেন। মুসলমানরা যখন এই সমালোচকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জোর দিয়েছিল, উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাদের অক্ষত হতে দিন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ক্ষমা করবেন এবং লোকদের কাছে সত্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন এবং ইসলামী আইন দাবি করলেই তাদের শাস্তি দেবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৪৬৯-৪৭০- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদেরকেও একই আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাই তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বপনকারীদের শাস্তি দেননি। এই শত্রুদের একটি দলকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এক শহর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা। কিন্তু এমনকি যখন তাদের সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, তখনও সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছিলেন এবং তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ব্যাখ্যা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যাতে তারা এ থেকে বিরত থাকে। তাদের মন্দ পরিকল্পনা। যদিও তারা তার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং এমনকি তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছিল, তবুও তিনি তাদের শাস্তি দেননি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 496-501- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই একই লোকদের তখন সিরিয়ার হোমসে পাঠানো হয়েছিল, যেটি আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদের গভর্নরের অধীনে ছিল , আল্লাহ তার উপর রহম করুন। অন্যদিকে, তিনি এই সমস্যা সৃষ্টিকারীদের সাথে আরও কঠোর আচরণ করতেন এবং নিয়মিত তাদের সমালোচনা করতেন। তিনি তাদের সর্বত্র তার সাথে যেতে বাধ্য করেছিলেন, যার ফলে তাদের জীবন কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা তাদের মন্দ পথ থেকে অনুতপ্ত হওয়ার ভান করেছিল। গভর্নর এই সমস্যা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে একজন আশতার আল নাখাইকে মদিনায় পাঠান যেখানে তিনি উসমান ইবনে আফফানের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, এবং তাদের খারাপ কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করার স্বাধীনতা দেন। তারা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল এবং তারপর আবার সমাজে বিভেদ বপনে লিপ্ত হল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৫০৪-৫০৫- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তারা এটির যোগ্য ছিল না, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি উপেক্ষা করেছিলেন এবং অত্যন্ত নম্রতা দেখিয়েছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমস্ত মুসলমান আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে

শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

গসিপ ছড়ানো

ইসলামের শত্রুরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা বুঝতে পেরেছিল, যেমন, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা মুসলমানরা বাহ্যিকভাবে পরাজিত হতে পারেনি। মানে, যুদ্ধ করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে মুসলমানদের পরাজিত করার একমাত্র উপায় ভিতরে থেকে। এই শত্রুদের অনেকেই, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করার জন্য বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কৌশল এমনভাবে কাজ করেছিল যে এমনকি সাহাবায়ে কেরামও, যারা তাদের গভর্নর ছিলেন, জনগণের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছিল। যখন খবর উসমানের কাছে পৌঁছল, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তাঁর গভর্নরদের তদন্ত করার জন্য তাঁর কর্মচারীদের পাঠান কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কিছুই পাননি। তাদের এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের শেষের দিকে এই মিথ্যাগুলো বেশি কার্যকর ছিল। অভিযানের সংখ্যা কমে যাওয়ায়, এই সৈন্যদের অনেকেই আর যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল না এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের বেশিরভাগ সময় খিলাফতের বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যয় করত, যেন তারা এর দায়িত্বে ছিল। এই মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই যেহেতু অজ্ঞ, বিশ্বাসে দুর্বল এবং গোত্রবাদ ও লোভে নিমজ্জিত ছিল, তাই তাদেরকে খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এতটা কঠিন ছিল না।

সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৭২- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ান তা সত্য হোক বা না হোক এবং এটি মানুষের মধ্যে সমস্যা, ভেঙ্গে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয় কারণ সে সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"ধ্বংস প্রত্যেক বিদ্রূপকারী ও উপহাসকারীর জন্য।"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? শুধুমাত্র সময় গল্প বহন গ্রহণযোগ্য যখন কেউ একটি বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা হয়.

একজন মুসলমানের জন্য এটা কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও…"

একজন মুসলমানের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অসৎ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ…"

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও একজন গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না।

জ্ঞানের অপব্যবহার

ইসলামের শত্রুরা, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মতবিরোধের বীজ বপন করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি এটি অর্জনের একটি উপায় ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের অপব্যাখ্যা করা। যেহেতু তারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ এবং বিশ্বাসের দুর্বল ছিল, তারা তার পরিকল্পনার জন্য পড়ে যায় এবং তার মিশনে যোগ দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৫- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান হল মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকৃত হবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সমস্ত কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। ফল গাছের মতো অন্যদের উপকার করার জন্য কিছু গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের মতো অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর কাজ করাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান

অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। এটা নিছকই বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

দুর্নীতি

সময়ের সাথে সাথে ইসলামের এই অভ্যন্তরীণ শত্রুরা আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। তাদের প্রভাব কুফা, বসরা এবং মিশরের মতো প্রধান স্থানে পৌঁছেছিল। এমনকি তারা পত্র জাল করে দাবি করে যে তারা সাহাবীদের কাছ থেকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমালোচনা করা চিঠি। সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তারা এমনকি দাবি করতে শুরু করে যে, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর খিলাফতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এবং তাঁর অধিকার ছিল। তাই দখল করা, যদিও আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, এমন একটি অযৌক্তিক জিনিস কখনও দাবি করেননি এবং প্রকৃতপক্ষে সর্বদা প্রথম তিন সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাকে রক্ষা ও আনুগত্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৯০- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভন্ডামির লক্ষণ হল একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়ায়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একটি পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ হওয়া সমস্ত সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের ব্যক্তি লোকেদের ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করেন কারণ এটি অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে চালিত করে যাতে লোকেরা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিণত হয়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে ধ্বংস করে এবং যখন তারা সুখী অন্য পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে তখন তাদের সুখকেও নষ্ট করে দেয়। তারা দোষ সন্ধানকারী যারা তাদের সামাজিক মর্যাদা নিচে টেনে আনতে অন্যের ভুল

উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করা শুরু করে এবং যখনই ভালো কথা বলা হয় তখন বধির আচরণ করে। শান্তি এবং শান্ত তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের বিনোদনের জন্য সমস্যা তৈরি করতে চায়। তারা সুনানে ইবনে মাজা, 2546 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ঢেকে রাখবে, মহান আল্লাহ তাদের দোষগুলো ঢেকে দেবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজবে এবং উন্মোচন করবে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। সুতরাং বাস্তবে, এই ধরনের ব্যক্তি সমাজের কাছে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের দোষগুলো উন্মোচন করছে যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষগুলো প্রকাশ করছে।

সহনশীলতা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে ইরাকের কুফা নগরীতে কিছু লোক ঝামেলা সৃষ্টি করতে থাকে। তারা ক্রমাগত তাদের গভর্নরদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করত এবং বারবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাদের সম্পর্কে অভিযোগ করত এবং তাদের প্রতিস্থাপনের জন্য জোর দিয়েছিল। উসমান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার তাদের কাছে লিখেছিলেন যে তিনি তাদের সাথে সহনশীল এবং ধৈর্যশীল হবেন। যে তিনি তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করবেন যতক্ষণ না এতে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা জড়িত না হয়। এবং তিনি তাদের অপছন্দের কিছু থেকে ক্ষমা করবেন, যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে জড়িত না। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তাদের সাথে এইভাবে আচরণ করার পরে তাদের খারাপ আচরণ করার কোনও অজুহাত নেই। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 359-360- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের

সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

মন্দ কাজের আদেশ এবং ভালো থেকে নিষেধ করা

কুফার গভর্নর, সাঈদ ইবনুল আস , আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করার সময়, মদিনায় ছিলেন, কুফার ঝামেলাকারীদের একজন নেতা আশতার আল নাখাই গভর্নর এবং খলিফা উসমান উভয়ের সম্পর্কে আরও মিথ্যা প্রচার করেছিলেন। ইবনে আফফান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, এর ফলে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের আরও ক্রোধিত করে। তিনি তাদের কুফার বাইরে শিবির স্থাপন করার জন্য এবং গভর্নরকে শহরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার আহ্বান জানান। তার সঙ্গে যোগ দেন প্রায় এক হাজার দুর্বৃত্ত। যখন সাঈদ, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, কুফায় পৌঁছেন তখন তিনি তাদের সাথে ধৈর্য ধরেছিলেন এবং তাদের কাছে তার মদিনায় ফিরে যাওয়ার দাবি ছিল এবং খলিফাকে আবু মুসা আল আশআরীকে তাদের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য আদেশ দেন। সাঈদ, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তিনি তাদের দাবি মেনে চলেন কারণ তিনি পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার ইচ্ছা করেননি। উসমান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি ধৈর্যের পথ বেছে নেওয়ার সাথে সাথে তাদের দাবিতেও সম্মত হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 508-510- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভন্ডামির একটি অংশ হল যে একজন ব্যক্তি কেবল নিজেরাই খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে তবে তারা অন্যকেও একই কাজ করতে উত্সাহিত করে। তারা চায় অন্যরা তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা স্বস্তি পায়। তারা শুধু নিজেরাই ডুবে না, অন্যকেও তাদের সাথে নিয়ে যায়। মুসলমানদের অবশ্যই জানা উচিত যে একজন ব্যক্তি তাদের আমন্ত্রণের কারণে পাপ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করা হবে। এই ব্যক্তিকে এমনভাবে গণ্য করা হবে যেন সে পাপ করেছে যদিও সে

অন্যদেরকে এর দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 203 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে ধন্য সেই ব্যক্তি যার মন্দ তাদের সাথে মারা যায় কারণ অন্যরা তাদের মন্দ উপদেশে কাজ করলে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদিও তারা আর নেই। জীবিত

অশান্তি সম্মুখীন

ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ বাড়তে থাকলে, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কিছু গভর্নরকে ডেকে তাদের সাথে বৈঠক করেন। তারা প্রত্যেকে পরামর্শ দিয়েছিল যে কীভাবে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের সাথে তার আচরণ করা উচিত। তাদের একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সাথে খুব বেশি নম্রতা প্রদর্শন করছেন, যেখানে তার পূর্বসূরি, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে এই ভদ্রতা দেখাতেন না। তাদের উপদেশ শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহের দরজা খুলে গেছে এবং কোন কিছুই জাতিকে প্রভাবিত করতে বাধা দিতে পারবে না, কারণ এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জোর দিয়েছিলেন যে তিনিই প্রথম সমস্যা সৃষ্টিকারীদের আক্রমণ ও ক্ষতি করে রাষ্ট্রদ্রোহের আগুন জ্বালাবেন না। পরিবর্তে, তিনি তাদের সাথে নম্রতা এবং ক্ষমার সাথে আচরণ করবেন, যদি না মহান আল্লাহর পবিত্র সীমা লঙ্ঘন করা হয়, সেক্ষেত্রে তিনি তাদের আইন অনুসারে শাস্তি দেবেন। তিনি গভর্নরদের একই আচরণ করার নির্দেশ দেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 518-519- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, এমনকি বিদ্রোহীদের দলে অনুপ্রবেশ করার জন্য দু'জন গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন, যা তারা সফলভাবে করেছিল। বিদ্রোহীরা তাদের অশুভ পরিকল্পনার কথা জানায়। তারা প্রথমে উসমান (রা.)-এর মুখোমুখি হতে চেয়েছিল, এবং তাকে এবং তার গভর্নরদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ আনতে চেয়েছিল। তারপর তারা তাদের শহরে ফিরে আসবে এবং লোকদের বলবে যে খলিফা অভিযোগগুলি সত্য বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু খলিফা পদ থেকে সরে যেতে বা তার আচরণ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অস্বীকার করেছেন। তারপর তারা পবিত্র

তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার ভান করবে এবং পরিবর্তে খলিফাকে ঘেরাও করার জন্য মদিনায় প্রবেশ করবে। তারা তাকে খলিফা পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে অথবা সে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করবে। যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের পরিকল্পনার কথা জানানো হয়, তখন তিনি সাহাবীগণকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে অবহিত করেন। তারা তাকে তাদের সুস্পষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য তাদের গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু উসমান, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে তাদের সাথে নম্রভাবে মোকাবেলা করতে বেছে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র তাদের শাস্তি দেবেন যদি তারা প্রকাশ্যে এমন একটি অপরাধ করে যা ইসলামী আইনে আইনত শাস্তিযোগ্য। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 521-522- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সমস্যা সৃষ্টিকারীদের এক ইঞ্চি দিয়েছিলেন এবং তারা তাঁর কাছ থেকে এক মাইল নিয়েছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কৌশল অবলম্বন করেননি। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নম্রতার বিশেষ ঐতিহ্য গ্রহণ করতে বেছে নিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় মুনাফিকদের কোনো ক্ষতি করেননি, যদিও তারা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছে। সে তার নিজের লোকদের হত্যাকারী হিসাবে স্মরণ করতে চায়নি। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জাতির মধ্যে বিদ্রোহের শিখা জ্বালিয়েছেন এমন ব্যক্তি হতে চাননি। তিনি জানতেন যদি তিনি প্রথমে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করেন তবে তারা এটিকে আরও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো এবং আরও সমর্থন সংগ্রহের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে, যা ইসলামী জাতির স্থিতিশীলতার জন্য আরও

ক্ষতির কারণ হবে। তার লক্ষ্য ছিল সাধারণ জনগণকে রক্ষা করা এবং তাদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করা, এমনকি যদি এই প্রক্রিয়ায় তাকে তার নিজের অধিকার এবং তার জীবন ছেড়ে দিতে হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার এই মনোভাব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে

ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

অটল খলিফা

সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাতের পর মদিনা ত্যাগ করার আগে তিনি তাকে দুটি বিকল্পের একটি গ্রহণ করার আহ্বান জানান। প্রথমটি ছিল যে, উসমান (রা.) তার সাথে সিরিয়ায় চলে যান এবং এটি তার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে কারণ সিরিয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ঝামেলামুক্ত ছিল। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি কখনই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর থেকে প্রস্থান করবেন না, যদিও এটি তাঁর মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল যে, মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে এবং শহরকে সার্বক্ষণিক পাহারা দেওয়ার জন্য মদিনায় একটি সেনা পাঠাবেন। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তিনি চান না যে শহরটি মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ বোধ করুক এবং তারা যে বিধান উপভোগ করত তা হ্রাস করুক, কারণ এটি নতুন সেনাবাহিনীতেও বিতরণ করা দরকার। মুয়াবিয়া উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এই বিদ্রোহ তার হত্যা বা মদিনা আক্রমণের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট এবং তিনি বিষয়ের সর্বোত্তম নিষ্পত্তিকারী। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 520-521- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি ধৈর্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং অবিচল ছিলেন, কারণ তিনি ভুল ছিলেন না। তিনি সত্যের উপর অবিচল থাকা অবস্থায় যদি বিদ্রোহীরা তার ক্ষতি করে, তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম যারা তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেছিল তারা স্পষ্টভাবে পার্থক্য করবে যে কে সত্যের উপর ছিল এবং কে মিথ্যার উপর ছিল। অথচ, তিনি যদি মদিনা থেকে পালিয়ে যান বা প্রথমে বিদ্রোহীদের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি সঠিক পথে আছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হতো। উপরন্তু, তিনি তার

ধৈর্য ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চেয়েছিলেন, যা তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে করেছিলেন, যখন তিনি তাকে বলেছিলেন যে এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা ঘটবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 529 এবং জামে আত তিরমিযী, 3711 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একটি ন্যায্য শুনানি

আরও ঝামেলা এড়াতে এবং নিজের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, সমস্যা সৃষ্টিকারীদের মদীনায় ডেকে পাঠান এবং সাহাবায়ে কেরামের সামনে প্রকাশ্যে তাদের প্রতিটি অভিযোগের জবাব দেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এবং মসজিদে নববী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য মুসলমানরা তাদের আলোচনা, যা নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে, ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 523-527- এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তারা বলে যে, আমি যখন সফরে যাই তখন আমি পূর্ণ নামায পড়ি এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর ও উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, আমার আগে তা করোনি। কিন্তু আমি মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় পূর্ণ নামায পড়েছিলাম যেহেতু মক্কা একটি শহর যেখানে আমার একটি পরিবার আছে, তাই আমি আমার পরিবারের সাথে থাকছি এবং আমি মুসাফির নই, তাই নয় কি? এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার সাথে একমত।

তিনি তখন বললেন, "তারা (বিজড়িত ভূমি) বলেছে যে আমি আমার জন্য (বিজিত জমি থেকে) চারণভূমি বরাদ্দ করেছি এবং মুসলমানদের জন্য কষ্টসাধ্য করেছি এবং আমার উটের জন্য বিস্তীর্ণ জমি বরাদ্দ করেছি। আমার সময়ের আগে, উটের জন্য চারণভূমি বরাদ্দ করা হয়েছিল যেগুলি ফরজ সদকায়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মহান আল্লাহ ও মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পথে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে সন্তুষ্ট, সমস্ত চারণ জন্য জমি বরাদ্দ. আমাকে সেই জমিতে যোগ করতে হয়েছিল কারণ ফরজ সদকা করা এবং

মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহৃত উটের সংখ্যা বেড়েছে। তদুপরি, আমি গরীবদের সেই জমিতে তাদের পশু চরাতে বাধা দেইনি। আমি আমার নিজের গবাদি পশুর জন্য এটি বরাদ্দ করিনি। যখন আমি খলিফা নিযুক্ত হলাম, তখন আমি উট ও ভেড়ার মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম ধনী ছিলাম , কিন্তু আমি সবই খরচ করে ফেলেছি এবং পবিত্র তীর্থযাত্রার জন্য যে দুটি উট রাখি তা ছাড়া এখন আমার কাছে কোনো পশুসম্পদ নেই। তাই না?" এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার সাথে একমত।

তখন তিনি বললেন, "তারা (বিড়ম্বনাকারীরা) বলে যে আমি পবিত্র কুরআনের একটি কপি রেখেছিলাম এবং বাকি সব পুড়িয়ে দিয়েছিলাম (যাতে তেলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল) এবং আমি লোকদেরকে একটি পাঠে একত্রিত করেছিলাম। পবিত্র কুরআন। কিন্তু পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী, যা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, এবং এটি সবই এক এবং আমি যা করেছি তা হল পবিত্র কুরআনের পিছনে মুসলমানদের একত্রিত করা এবং তাদের এ বিষয়ে মতভেদ করতে নিষেধ করা। এটি করার মাধ্যমে আমি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম, যিনি পবিত্র কুরআন (বই আকারে) সংকলন করেছিলেন। তাই না?" এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার সাথে একমত।

তিনি তখন বলেন, "তারা (বিপত্তি সৃষ্টিকারীরা) বলে যে আমি হাকাম ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফে নির্বাসিত করেছিলেন। হাকাম ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে এসেছেন, মদিনা থেকে নয় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কা (মদিনা নয়) থেকে নির্বাসিত করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাঁকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তায়েফে

পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে মক্কায় ফিরে আসতে দেন। তাই না?" এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার সাথে একমত।

তিনি তখন বললেন, "তারা (সমস্যাকারীরা) বলে যে আমি যুবকদের নিয়োগ করেছি এবং যুবকদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছি। কিন্তু আমি এমন কাউকে নিযুক্ত করিনি, যিনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এরা সেই লোক যাদের উপর তারা নিযুক্ত হয়েছিল – যাও এবং তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আমার আগে যারা এসেছিল তারা এমন কয়েকজনকে নিয়োগ করেছিল যারা আমার গভর্নরদের চেয়েও ছোট ছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেছিলেন, যখন তিনি আমার নিযুক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে ছোট ছিলেন এবং তারা (লোকেরা) মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আরও কঠোরভাবে কথা বলেছিল। বরকত বর্ষিত হোক, (নিযুক্ত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে) তারা আমার সাথে কথা বলেছে। তাই না?" এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার সাথে একমত।

তখন তিনি বললেন, "তারা বলে যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবিল সারহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলাম, যা মহান আল্লাহ যুদ্ধের সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাকে লুটের এক-পঞ্চমাংশ দিয়েছিলাম - যা ছিল এক লক্ষ - যখন সে উত্তর আফ্রিকা জয় করেছিল, তার প্রচেষ্টার পুরষ্কার হিসাবে। আমি তাকে বললাম: "যদি মহান আল্লাহ আপনাকে উত্তর আফ্রিকা জয় করতে সক্ষম করেন, তবে আপনি পুরস্কার হিসাবে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ পাবেন।" আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সামনে তা করেছিলেন যদিও কিছু সৈন্য তাকে আমার উপহার দিতে আপত্তি করেছিল। অতঃপর আমি ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে সৈন্যদের দিয়ে দিলাম এবং ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুই নেননি। তাই না?" এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার সাথে একমত।

তিনি তখন বললেন, “তারা (সমস্যাকারীরা) বলে যে আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসি এবং তাদের প্রতি উদার। আমার পরিবারের প্রতি আমার ভালবাসার জন্য, এটি আমাকে তাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট করেনি বা অন্যদের প্রতি অবিচার বা দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে তাদের সমর্থন করেনি। বরং সবার মতো তাদেরও কর্তব্য আছে এবং আমি তাদের কাছ থেকে তাদের পাওনা নিই। তাদের দান করার ক্ষেত্রে, আমি তাদেরকে আমার নিজের সম্পদ থেকে দিয়েছি, মুসলমানদের সম্পদ থেকে নয়, কারণ আমি মুসলমানদের সম্পদকে আমার জন্য হালাল মনে করি না এবং তা করার অধিকার কারো নেই। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়ে আমার নিজের সম্পদ থেকে উদারভাবে দান করতাম। সে সময় আমি খরচের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক ছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক এবং আমার জীবনের শেষের দিকে চলে এসেছি এবং তাই আমার সম্পদ আমার পরিবার এবং আত্মীয়দের দিয়েছি। জালেমরা যা বলে তাই বলুক। মহান আল্লাহর শপথ, আমি কোনো মুসলিম শহর থেকে কোনো সম্পদ বা উদ্‌বৃত্ত নিইনি। আমি ঐ শহরগুলোকে তাদের ধন-সম্পদ রাখতে দিয়েছি এবং যুদ্ধের গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত মদিনায় আর কিছুই আনিনি। মুসলমানরা বাকি চার-পঞ্চমাংশ ভাগ করার যত্ন নিল এবং যারা এর প্রাপ্য তাদের দিয়ে দিল। আমি সেই লুঠ থেকে এক পয়সা বা অন্য কিছুও নিইনি। আমি কেবল আমার নিজের সম্পদ থেকে খাই এবং আমি কেবল আমার নিজের সম্পদ থেকে আমার পরিবারকে দেই।"

তিনি তখন বললেন, “তারা (বিপত্তি সৃষ্টিকারীরা) বলে যে আমি বিজিত জমিগুলো কিছু লোককে দিয়েছিলাম, অথচ মক্কা ও মদিনার সাহাবীগণ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং অন্যান্য সৈন্যরা এই জমিগুলো জয়ে অংশ নিয়েছিল। অথচ আমি এই জমিগুলো বিজেতাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং কেউ কেউ মদিনায় বা অন্য কোথাও তাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসে কিন্তু সেই জমি তাদের দখলে থাকে এবং কেউ কেউ জমি বিক্রি করে তার মূল্য তাদের কাছে রেখে দেয়।”

সমস্যা সৃষ্টিকারীরা তার স্পষ্ট ব্যাখ্যাকে পাত্তা দেয়নি কারণ তারা সত্যের সন্ধান করছিল না, কেবল অশান্তি। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে শাস্তি দেননি, যদিও অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। পরিবর্তে তিনি তাদের শান্তিতে মদিনা ত্যাগ করার অনুমতি দেন।

ভাল উপদেষ্টা

এই কঠিন সময়ে, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে সিদ্ধান্ত নেননি। বরং, তিনি সর্বদা জ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, এই আশায় যে এটি বিদ্রোহ হ্রাস করবে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য বৃদ্ধি করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন-নুরাইন , পৃষ্ঠা 529-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর অবরোধ ও শাহাদাত

মন্দ প্লট

সমস্যা সৃষ্টিকারীরা তাদের চূড়ান্ত মন্দ পরিকল্পনাকে কাজে লাগায়। তারা পবিত্র তীর্থযাত্রা সম্পাদন করার জন্য একত্রিত হওয়ার ভান করেছিল এবং তাই তীর্থযাত্রীদের সাথে তাদের শহরগুলি ত্যাগ করেছিল কিন্তু পরিবর্তে খলিফা উসমান ইবনে আফফানকে অবরোধ করার জন্য মদিনার দিকে রওনা হয়েছিল। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং মদিনায় বসবাসকারী আন্তরিক মুসলমানরাও পবিত্র তীর্থযাত্রার জন্য রওয়ানা হন এবং তাই শহরটি আরও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। প্রতিটি শহরের প্রতিটি বিদ্রোহী দল ঘোষণা করতে যাচ্ছিল যে, তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে একজন বিশেষ সাহাবীকে খলিফা করতে চায়। বিভিন্ন লোককে বাছাই করে বিদ্রোহীরা আরও বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

যখন প্রতিটি দল সেখানে পৌঁছায় তখন তারা উসমান (রা.)-এর মুখোমুখি হয় এবং কিছু বানোয়াট অভিযোগ নিয়ে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে। তিনি এবং অন্যান্য কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, প্রত্যেকের সাথে আলোচনা করেন যতক্ষণ না তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, যেমন বিভিন্ন লোককে তাদের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করা। এমন একটি চুক্তি যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী নয়। ফলে দলগুলো যা অর্জন করেছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মদিনা ত্যাগ করে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টিকারী নেতারা উসমান (রা.)-কে অপসারণ বা তাকে হত্যা করার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, তাই তারা একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়।

তারা একটি চিঠি জাল করার সিদ্ধান্ত নেয় যেটি খলিফা মিশরে তার গভর্নরকে মদীনা সফরকারী মিশরীয় প্রতিনিধিদলকে গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। যখন মিশরীয়রা এই চিঠিটি খুঁজে পায় তখন তারা খলিফার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মদিনায় ফিরে যায়, যিনি এটি সম্পর্কে জানতে অস্বীকার করেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, ইরাক থেকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে মিশরীয় প্রতিনিধিদলের সাথে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনওভাবে জানানো হয়েছিল, যদিও তারা মদিনা থেকে বিপরীত দিকে বাড়ি যাচ্ছিল। মিশরীয়রা একই সময়ে মদিনায় ফিরে আসে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ইরাক থেকে সমস্যা সৃষ্টিকারীরা আগে থেকেই জাল চিঠি সম্পর্কে আগে থেকেই জানত, অন্যথায় তারা মিশরীয়দের একই সময়ে মদিনায় ফিরে যেতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, এটি খুঁজে বের করেছিলেন এবং তাদের এই অভিযোগ করেছিলেন। তাদের একটি চিঠি জাল করা কোন বিস্ময়কর বিষয় ছিল না কারণ তারা অনেক চিঠি তৈরি করেছিল যা অনুমিতভাবে সাহাবীদের দ্বারা পাঠানো হয়েছিল, যেমন আলী ইবনে আবু তালিব এবং মুমিনদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যা জনগণকে বিদ্রোহ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। খলিফা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 531-537- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদাই, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

ভাল অন্যদের সাহায্য

বিদ্রোহীরা যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তারা উসমান ইবনে আফফানকে অবরুদ্ধ করে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, এমনকি তাকে তার বাড়ি থেকে বের হতে এবং খাদ্য ও পানির মতো মৌলিক বিধানগুলি পেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার বাড়ি থেকে বের হতে না পারায় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে ফরজ নামাজের ইমামতি করতে পারেননি। বিদ্রোহীদের একজন নেতা নামাজের ইমামতি করেছিলেন এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, নিজেরাই নামাজের ইমামতি করা থেকে বিরত ছিলেন কারণ এটিকে বিদ্রোহীদের সমর্থনের কাজ হিসাবে দেখা যেতে পারে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এই বিদ্রোহীর পিছনে নামায পড়ার বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছিল এবং তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে যখনই লোকেরা ভাল কিছু করছে তখন একজন ব্যক্তি যেন তাদের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু লোকেরা যদি খারাপ কিছু করে তবে একজন ব্যক্তির তাদের সাথে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৫৩৮-৫৩৯- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের বিদায়ের পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা এই যুক্তিকে কোনো না কোনোভাবে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কর্ম করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলমান একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন

অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আবু বক্কর সিদ্দিককে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর বিন খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি যদি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করেন তবে সমাজ তাকে ভুলে যাওয়ার চিন্তা করতেন না। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান কেবলমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ করা হয় তখন তারা তাকে খলিফা পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলে অথবা তারা তাকে হত্যা করে। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাঁকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ যদি তাঁকে কর্তৃত্ব অর্পণ করেন, তবে মুনাফিকরা দাবি করলেও তিনি তা ছেড়ে দেবেন না। তাকে, যতক্ষণ না সে তার সাথে (পরবর্তী জগতে) দেখা করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১১২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর উসমানকে অনুরোধ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, পদত্যাগ করবেন না, কারণ এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি ঐতিহ্য স্থাপন করবে যে লোকেরা যখন তাদের খলিফাকে অপছন্দ করবে তখন তারা তাকে পদত্যাগ করতে বা হত্যা করতে বাধ্য করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 539-540- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি উসমান (রাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, তাহলে ক্ষমতাটি জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী গুন্ডাদের হাতে একটি খেলার খেলনা হয়ে যেত। এটি সমাজের মধ্যে থাকা অপরাধীদের সমাজ পরিচালনা করার অনুমতি দেবে কারণ তারা যখন খুশি তখন দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করবে। এতে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যদি তিনি বিদ্রোহীদেরকে চূর্ণ করেন, যা করার ক্ষমতা তার ছিল, তবে এটি তাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আরও একটি অজুহাত দেবে। এবং তিনি মুসলিমদের রক্তপাতকারী নেতা হতে চাননি। ধৈর্য্য

ধারণ করে, তিনি সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি সঠিক এবং বিদ্রোহীরা ভুল।

যখন তারা তাকে হত্যার হুমকি দেয়, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তাকে হত্যা করার জন্য তাদের কোন ভিত্তি নেই কারণ তিনি কখনও কোন পাপ করেননি, বা তিনি এমন কোন পাপের জন্য অভিযুক্ত ছিলেন না, যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়, যা হল: ধর্মত্যাগ, ব্যভিচার বা আইনি প্রতিশোধের ক্ষেত্রে যেখানে একজন হত্যাকারীকে বেআইনিভাবে কাউকে হত্যা করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4024 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল যে তার জীবন হুমকির মধ্যে ছিল তবুও তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে

পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

জ্ঞান ব্যবহার

যখন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন, তখন তিনি শান্তভাবে তাদের ভুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি তাদের একজন প্রতিনিধিকে তার কাছে আসার জন্য অনুরোধ করলেন এবং তারা সাসাহ ইবনে সাওহানকে পাঠালেন । তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের ভুল উদ্‌ধৃতি করেছিলেন কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহীদের কাছে এর প্রকৃত ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং কীভাবে পবিত্র কুরআন তাকে তাদের বিরুদ্ধে সমর্থন করে এবং অন্যভাবে নয়। সাসাহ ইচ্ছাকৃতভাবে অধ্যায় 22 আল হজ্জ, আয়াত 39 এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একই আয়াত পাঠ করলেন এবং এর পরের আয়াতগুলি প্রমাণ করলেন যে তিনি সঠিক ছিলেন, যেমন মহান আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং তিনি তা পূরণ করেছেন। পরিপূর্ণতা আয়াত মধ্যে উল্লেখ বৈশিষ্ট্য. এমন কিছু যা বিদ্রোহীরা পুরোপুরি জানত কিন্তু পাত্তা দেয়নি কারণ সত্য প্রতিষ্ঠার সাথে তাদের ইস্যুটির কোনো সম্পর্ক নেই। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 39-41:

“যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের [যুদ্ধের] অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাদের বিজয় দিতে সক্ষম। [তারা] যারা অধিকার ছাড়াই তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে - শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা বলে, "আমাদের প্রভু আল্লাহ।" আর যদি আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা না করেন, কিছু অন্যের মাধ্যমে, তাহলে সেখানে মঠ, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেত যেখানে আল্লাহর নাম বেশি উচ্চারিত হয় [অর্থাৎ প্রশংসিত]। এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদের সমর্থন করবেন যারা তাকে সমর্থন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরাক্রমশালী। [এবং তারা] তারা যারা, যদি আমি তাদেরকে দেশে কর্তৃত্ব দেই, তবে নামায কায়েম

করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। এবং [সকল] বিষয়ের ফলাফল আল্লাহরই।

সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 543-544- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান হল মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকৃত হবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সমস্ত কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। ফল গাছের মতো অন্যদের উপকার করার জন্য কিছু গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের মতো অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে

দাঁড়ায়। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর কাজ করাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। এটা নিছকই বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

আন্তরিকতার শিখর

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ করা হয় তখন তিনি তাদের শান্ত করার এবং জাতির উপর যে বিপদ ডেকে আনছিল তা এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, তাকে হত্যা করলে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি তাদের তার গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে তার গভীর আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি একজন শহীদ ছিলেন; হুদাইবিয়ায় তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকারের সময় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁর নিজের হাত ব্যবহার করেছিলেন; নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদের সম্প্রসারণ, যখন পরেরটি এটির জন্য আহ্বান করেছিল; তিনি তাবুকের যুদ্ধের সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করেছিলেন; এবং তিনি রুমার কূপ ক্রয় করে মদীনাবাসীদের জন্য দান করেন।

একজন বিদ্রোহী নেতার দ্বারা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হলে তিনি নিজেকেও রক্ষা করেছিলেন। তিনি ইসলামে প্রবেশকারী চতুর্থ ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁকে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন এবং যখন তিনি মারা যান, তখন তিনি তাঁর অপর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইসলাম গ্রহণের আগে বা পরে সে কখনো ব্যভিচার বা চুরি করেনি। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। তিনি পবিত্র কুরআন সংকলন (মুখস্থ) করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে। আর যেহেতু তিনি মুসলিম হয়েছেন, তাই তিনি প্রতি শুক্রবার একটি ক্রীতদাস বা শুক্রবারে দুটি ক্রীতদাস মুক্ত করতেন যদি সপ্তাহের আগে একটি মুক্ত করতে না পারেন।

সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 544-547 এবং মুসনাদে আহমদ, 420 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সমস্ত কাজ এবং আরও অনেক কিছু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আন্তরিকতার গভীর স্তর নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আন্তরিকতার প্রতি: আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন, পবিত্র নবী মুহাম্মদের প্রতি, শান্তি। এবং তার উপর, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত , যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

ধৈর্য অবলম্বন করা

যখন উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁকে অনেক সাহাবী সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা তাঁকে যুদ্ধ করতে এবং বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় সংকল্প, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তখনই বৃদ্ধি পায় যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যে, তিনি ইন্তেকালের পর অশান্তি শুরু হবে। তাদের কষ্ট দাও। যখন তারা তাকে নিরাপত্তা লাভের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং তার দলের সাথে নিরাপত্তা খুঁজে পাওয়া উচিত এবং তারপর মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে ধৈর্য ধরে থাকতে এবং যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বিদ্রোহীদের রক্ত ঝরাতে বা তাঁর জন্য তাদের রক্ত ঝরাতে অনুরোধ করেছিলেন। এক পর্যায়ে উসমানের সাথে 700 জনেরও বেশি আন্তরিক মুসলমান ছিল, যার মধ্যে সাহাবীগণও ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সবাই তাকে যুদ্ধ ও রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু তিনি তাদের নিষেধ করেছিলেন।

আল মুগীরাহ ইবনে শুহবাহ উসমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, হয় যুদ্ধ করতে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ডানদিকে ছিলেন অথবা মক্কায় পালিয়ে যান যেখানে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে বিদ্রোহীরা সেখানে তাকে আক্রমণ করবে না বা সিরিয়ায় পালিয়ে যেতে যেখানে গভর্নর রক্ষা করবেন। তাঁর অর্থ, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন যে তিনি প্রথম মুসলিম নেতা হতে যাচ্ছেন না যিনি মুসলমানদের রক্তপাত করেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনি মক্কায় পালিয়ে গেলেও তারা

এটি আক্রমণ করবে। আর তিনি কখনোই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শহর থেকে সিরিয়া বা অন্য কোন স্থানে পালিয়ে যাবেন না।

সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 547-551- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কষ্টের শুরুতে প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় দুর্যোগের মানে, কঠিন শুরু থেকেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, অবশেষে সময়ের সাথে সাথে সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

মুসলমানদের তাই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা সর্বোত্তম হয়, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে, তাদের অনেকবার চিন্তা করা উচিত যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখনও কিছু ভাল ছিল, এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়েছিল। মানুষের চরম অদূরদর্শীতা এবং সীমিত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা একজন মুসলিমকে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য দেখাতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি সহজে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে এমনকি যদি তারা শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধরে অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত মারাত্মক ফাঁদ। সে ধৈর্য ধরে কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করে শুধু একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করার জন্য। পবিত্র কোরান স্পষ্ট করে বলেছে যে একজন মুসলমান বিচার দিবসে যা নিয়ে আসবে তার জন্য পুরষ্কার পাবে, অর্থাত্, তারা মারা গেলে তাদের সাথে নিয়ে যাবে এটি ঘোষণা করে না যে তারা কেবল একটি কাজ করার পরে পুরস্কার পাবে, যেমন শুরুতে ধৈর্য প্রদর্শন করা। একটি অসুবিধা অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

পরিশেষে, জীবনে একজন মুসলমান সর্বদা হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা অসুবিধার সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার

সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

ধৈর্যের কারণ

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন তখন তিনি ধৈর্য অবলম্বন করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন। এই মনোভাবের কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে: তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি ধৈর্যের সাথে এই ঘটনাটি সহ্য করবেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৭১১ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি মুসলিমদের রক্ত ঝরানো নেতা হতে চাননি।

তিনি আন্তরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, যদি মহান আল্লাহ তাঁকে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করেন এবং মুনাফিকরা চায় যে তিনি এই কর্তৃত্বের পোশাকটি খুলে ফেলবেন, তবে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১১২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি জানতেন যে বিদ্রোহীরা কেবল তার ক্ষতি করতে চায় তাই তিনি চান না যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট সাহাবীদের মধ্যে, বা আন্তরিক মুসলমানরা তার কারণে আহত বা নিহত হোক।

তিনি সচেতন ছিলেন যে তিনি একটি বিশাল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবেন এবং সত্যকে ধৈর্য ধরে মেনে চলতে অন্যায়ভাবে নিহত হবেন। একাধিক অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন , যেমন জামে আত তিরমিযী, 3708 এবং 3704 নম্বরে এবং সহীহ বুখারি, 7097 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলি।

তিনি হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শহীদ করার আগের রাতে স্বপ্নে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে রোজা ভাঙতে বললেন। পরের দিন তার সাথে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তার শাহাদাত নিকটবর্তী।

যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা তাকে বিচার দিবসে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান দেবে।

যদি উসমান (রাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, তাহলে ক্ষমতাটি জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী গুন্ডাদের হাতে একটি খেলার খেলনা হয়ে যেত। এটি সমাজের মধ্যে থাকা অপরাধীদের সমাজ পরিচালনা করার অনুমতি দেবে কারণ তারা যখন খুশি তখন দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করবে। এতে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যদি তিনি বিদ্রোহীদেরকে চূর্ণ করেন, যা করার ক্ষমতা তার ছিল, তবে এটি তাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আরও একটি অজুহাত দেবে।

ধৈর্য্য ধারণ করে তিনি সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে তিনি সঠিক এবং বিদ্রোহীরা ভুল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 551-553- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তান তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলমানকে বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তৃপ্তি।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর কাজ করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি অবস্থাই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল বা সন্তুষ্ট আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সিদ্ধান্তে, সহজ ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলমান কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের

বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে আচরণ করা, যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করবে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার

মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জেনে তাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান তাদের যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি পর্যালোচনা করা, যা ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে দেওয়া পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা একজন মুসলিমকে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের

মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের উৎকর্ষ হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন একজন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবে না যার ভয় ছিল, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

অন্যদের ভিন্নভাবে উপদেশ দেওয়া

মুমিনদের মায়েরা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ উসমান ইবনে আফফানকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাকে অবরুদ্ধ করা হয়, তখন বিদ্রোহীরা তার কাছে খাবার ও পানি পৌঁছাতে বাধা দেয় এবং তাই কিছু মুমিনের মা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, ব্যক্তিগতভাবে তার বাড়িতে পানি ও খাবার নিয়ে যান কিন্তু তাদের সওয়ারী পশুদের তার বাড়ির কাছে আসতে বাধা দেওয়া হয়। . তাদের সরাসরি আক্রমণ করা হয়নি কারণ এটি একটি সর্বাত্মক লড়াইয়ের দিকে পরিচালিত করবে। মুমিনদের কিছু মায়েরা, যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, প্রথমে মৌখিকভাবে বিদ্রোহীদের তাদের মন্দ পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু যখন তারা মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন, তখন তিনি তাদের প্ররোচিত করে তার কর্মের মাধ্যমে তাদের পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। পবিত্র তীর্থযাত্রা করতে তার সাথে যোগ দিন। কিন্তু এই পরিকল্পনা যথেষ্ট কার্যকর ছিল না, কারণ বিদ্রোহীরা তাদের মন্দ পরিকল্পনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 554-557- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ভাল আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তবুও তারা এমন লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের দেওয়া উপদেশ শোনে বা আমল করে না বলে মনে হয়। বিশেষ করে এই দিন এবং বয়সে এটি বেশ স্পষ্ট। এই ধরনের ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে না দেওয়াই ভাল কিন্তু নিজের কৌশল পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করা। কথার মাধ্যমে অন্যকে উপদেশ দেওয়া ভালোর আদেশ এবং মন্দ থেকে নিষেধ করার একটি উপায় কিন্তু একটি উত্তম উপায় হল নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যকে উপদেশ দেওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক যেমন তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দিতেন। উদাহরণ কৌশল দ্বারা এই নেতৃস্থানীয় গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি ইতিবাচক উপায়ে অন্যদের

প্রভাবিত করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যারা এখনও ভালোর আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার এই কৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তাদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। একজনের একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দেখানো চালিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু সম্ভবত মৌখিকভাবে তাদের উপদেশ দেওয়া থেকে এক ধাপ পিছিয়ে নেওয়া উচিত কারণ যারা মনোযোগ দেয় না তাদের ক্রমাগত উপদেশ দেওয়া উভয় পক্ষকে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হতে পারে। এটি একজন মুসলমানের যে মনোভাবের অধিকারী হওয়া উচিত তা বিরোধিতা করে যখন তারা অন্যকে ভালোর দিকে পরামর্শ দেয়। এটি একটি দুঃখজনক সত্য যে একজনকে মৌখিকভাবে নিজেকে এমন লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় যারা তারা কী বলতে চায় তা চিন্তা করে না। কিন্তু তাদের উচিত তাদের কর্মের মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দেওয়া। এইভাবে একজন ব্যক্তি কেবল তাদের নিজস্ব চরিত্রকে পরিমার্জিত করেই সাহায্য করে না, বরং ভালোর আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্বও পালন করে। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 17:

"...সৎকাজের নির্দেশ দাও, অন্যায়কে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। প্রকৃতপক্ষে, [সমস্তই] বিষয়গুলির [প্রয়োজনীয়] সমাধান।"

নো কম্প্রোমাইজিং অন ফেইথ

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, বিদ্রোহীরা একটি চিঠি জাল করে দাবি করেছিল যে এটি উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। চিঠিতে বলা হয়েছিল যে মিশরের গভর্নরের উচিত মিশরীয় প্রতিনিধিদলকে আটক করা এবং মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যেটি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিতর্কের পর মদিনা থেকে ফিরে এসেছিল। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন। তিনি বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছিলেন যে চিঠিটি হয় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল, অথবা তাঁর একজন সহযোগী, যেমন মারওয়ান ইবনে আল হাকাম এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ন্যায়বিচার পরিবেশন করা মারওয়ানের মতো তার সহযোগীদের মধ্যে একজন এই চিঠিটি লিখেছিলেন এটা খুবই অসম্ভাব্য ছিল কারণ এটি স্পষ্ট ছিল যে এই চিঠিটি কেবল উসমানের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে বিদ্রোহীদের কাছে একটি সত্যিকারের অধিকার থাকবে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিদ্রোহ করার কারণ। এটা খুবই অসম্ভাব্য ছিল যে তার সহযোগীদের মধ্যে একজন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করছে, কারণ তারা সবাই তার প্রতি যত্নবান ছিল, কারণ তিনি তাদের সাথে অত্যন্ত ভালবাসা এবং সম্মানের সাথে আচরণ করেছিলেন। অতএব, চিঠিটি স্পষ্টতই বিদ্রোহীদের নেতাদের দ্বারা জাল ছিল যারা আগে চিঠি জাল করেছিল।

অধিকন্তু, উভয়েই মুমিনদের মা, আয়েশা বিনতে আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের বোন, এবং তাঁর মা আসমা বিনতে উমাইস রা . তার সাথে, বুঝতে পেরেছিল যে বিদ্রোহীরা তাকে মিথ্যা বিশ্বাস করার জন্য প্রতারিত করেছে। তারা তাকে উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের পরামর্শ কার্যকর হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে

আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 557-558- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে আবু বক্কর, আল্লাহ তার উপর রহম করুন, প্রথমে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার কর্ম থেকে অনুতপ্ত হন এবং উসমানকে হত্যা করা থেকে তার হাত বন্ধ করে দেন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা , পৃষ্ঠা 174- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

তার মা এবং বোন উভয়ই তার সাথে তাদের সম্পর্ককে দেখেননি এবং পরিবর্তে সত্যকে মেনে চলেন, এমনকি যদি এর অর্থ তারা তাদের নিজের আত্মীয়ের সমালোচনা করে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

ঐক্যের আহ্বান

যখন উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে পবিত্র তীর্থযাত্রার নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করেছিলেন কারণ তিনি খলিফার সাথে থাকতে এবং তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। . উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে একটি চিঠি পাঠান যা হজ্জের মৌসুমে জনসাধারণের কাছে পাঠ করা হবে। চিঠিতে মদিনার পরিস্থিতি, বিদ্রোহীদের সমালোচনা এবং তাদের প্রতি তার জবাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এটি যা ঘটেছে তা নির্বিশেষে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা ৫৫৯-৫৬৮- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাহাবীদেরকে প্রকাশ্যে অনুরোধ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এবং আন্তরিক মুসলমানদের বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ বা মোকাবিলা না করার জন্য এবং তারা সকলেই অনিচ্ছায় তাঁর অনুরোধ মেনে নিলেন এবং তারা কেবল কয়েকজন অল্পবয়সী সাহাবীকে নিয়োগ করলেন। খলিফার ঘরের দরজায় আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং অনুসারীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 570-571- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এমন কঠিন সময়েও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের ঐক্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতিকে সমুন্নত রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি

নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ

তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

খলিফার আত্মত্যাগ

তীর্থযাত্রার মরসুম শেষ হলে অনেক তীর্থযাত্রী খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষা করার জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলের গভর্নরদের দ্বারা অনেক সৈন্যও পাঠানো হয়েছিল। বিদ্রোহীদের নেতারা এটি শুনেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে তাদের শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার অন্যথায় তারা বিরোধিতার দ্বারা পরাস্ত হবে। তাঁর শাহাদাতের দিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রোজা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বপ্নে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দেখেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাদের সাথে ইফতার করতে বলেছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, তিনি সেদিন মারা যাবেন। উসমান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, জানতেন যে তিনি একজন শহীদ হতে চলেছেন এবং তাই তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য কাউকে অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে আরও সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ এটি তার জীবন রক্ষা না করে শুধুমাত্র রক্তপাত এবং অনৈক্য ঘটাবে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং কিছু সহিংসতা শুরু হলে যুদ্ধ না করার জন্য তাঁর বাড়িতে অবস্থানকারী আন্তরিক মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পর, আন্তরিক মুসলমানদের শেষ পর্যন্ত চলে যেতে রাজি করায়, কিছু বিদ্রোহী উসমান (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং যখন তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন তখন তাঁকে আক্রমণ করে। তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল এবং সেও এনকাউন্টারে আহত হয়েছিল। এমনকি তিনি তাদের দিকে চিৎকার করে বলেছিলেন যে তারা এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় যে সারা রাত জেগে নামাজের এক চক্রে পুরো পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তাতেও দুষ্টদের নিবৃত্ত করা যায়নি। তারা খলিফা উসমান ইবনে আফফানকে শহীদ করে, এবং তার রক্ত পবিত্র কুরআনের 2 অধ্যায়, 137 নং আয়াতে ছিটকে পড়ে:

" সুতরাং তারা যদি বিশ্বাস করে যেভাবে আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়েছে; অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা কেবল মতভেদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর তিনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"

উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শহীদ করার পর, তারা তার বাড়ি এমনকি সরকারী কোষাগার লুটপাট করে, যদিও এতে কার্যত কিছুই ছিল না কারণ উসমান রা.

এই ঘটনাটি ঘটেছিল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরতের ৩৫ তম বছরে, যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল ৮২ বছর।

সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁর শাহাদাতে গভীরভাবে শোকাহত হয়েছিলেন এবং মৌখিকভাবে তাদের হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, যেমন সাদ ইবনে আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেছিলেন এবং তারপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহামানব, ঝামেলাকারীদের পাকড়াও করতে। এবং তার প্রার্থনা গৃহীত হয় এবং বিদ্রোহীদের সকল নেতাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-106:

" বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কাজের ব্যাপারে অবহিত করব? [তারা] তারাই যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।" তারাই যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। এবং আমরা কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন [অর্থাৎ গুরুত্ব] নির্ধারণ করব না। এটা তাদের প্রতিফল - জাহান্নাম - যার জন্য তারা অস্বীকার করেছিল এবং [কারণ] তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং আমার রসূলদেরকে উপহাস করেছিল।"

সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 571-580- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা) কে খলিফা নির্বাচিত করা

আরও অশান্তি

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত আরও বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এই ঘটনার কারণে মুসলিম জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আজ পর্যন্ত তাই রয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অনেক বিপর্যয় ঘটে। দুষ্টরা জয়লাভ করলো এবং ধার্মিকরা পরাজিত হলো। মন্দ কাজকারীরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আরও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ধার্মিকরা তা কাটিয়ে উঠতে ভালকে ছড়িয়ে দিতে অক্ষম হয়। লোকেরা আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনুগত্যের শপথ করেছিল, যিনি অনিচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন এবং তিনি সেই সময়ে পরবর্তী খলিফা হওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন এবং যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে সেরা ছিলেন, কিন্তু লোকেরা বিভক্ত ছিল। বিদ্রোহের আগুন জ্বালানো হয়েছিল। ঐক্য ভেঙ্গে যায় এবং কোন শৃঙ্খলা অবশিষ্ট ছিল না এবং নতুন খলিফা এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তারা কল্যাণ ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যা চেয়েছিলেন তা অর্জন করতে সক্ষম হননি।

বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্ভাসিত দুটি আধ্যাত্মিক রোগ বাকী জাতিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে: সন্দেহের পরীক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার পরীক্ষা। সন্দেহের বিচার ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতার কারণে ঘটে যা ঈমানের দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায়। ঈমানের দুর্বলতা থাকলে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া সহজ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করে তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়। এটি এমনকি ইসলামের নামে নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। উপরন্তু, এটি

একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি আশার পরিবর্তে ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে। ইচ্ছাকৃত চিন্তার মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করা, তবুও বিশ্বাস করা যে তিনি ক্ষমা করবেন।

আকাঙ্ক্ষার পরীক্ষায় পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া জড়িত। তাদের কামনা-বাসনা তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত লাভ, ভোগ ও সঞ্চয় করতে এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী হলে, তারা একজনকে অবৈধ এবং এমনকি সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের জন্য অন্যের ক্ষতি করার জন্যও প্ররোচিত করতে পারে। আকাঙ্ক্ষা একজনকে মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলি বেছে নেওয়ার জন্য উত্সাহিত করে, যার ফলে কেউ তাদের ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুসারে মেনে চলে এবং উপেক্ষা করে। এই ব্যক্তি এমনকি তাদের ইচ্ছা পূরণের ন্যায্যতার জন্য ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে। পরকালকে উপেক্ষা করা একজনকে তাদের জবাবদিহিতা মনে রাখতে বাধা দেয় এবং যখন এটি ঘটে তখন যে কোনও কাজ করা সম্ভব হয়।

সন্দেহ এবং আকাঙ্ক্ষা উভয় পরীক্ষারই নিরাময় হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শেখা এবং তার উপর আমল করা, যাতে একজন ব্যক্তি ঈমানের নিশ্চিততা লাভ করে। এটি সন্দেহ এবং আকাঙ্ক্ষার পরিণতির বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে কাজ করে।

যদিও ইসলামী জাতির মধ্যে অশান্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তবুও তা খলিফা, আলী ইবনে আবু তালিব এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে বাধা দেয়নি। . কিন্তু যারা গোমরাহীর উপর অটল থেকেছে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করেছে তারা দুনিয়াতে তাদের

বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম থেকে রেহাই পায়নি এবং আখেরাতে অবশ্যই তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তারাও। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 227:

"...এবং যারা অন্যায় করেছে তারা জানতে পারবে তারা কি [ধরনের] প্রত্যাবর্তন করবে।"

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে মুছে ফেলে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও লোকেদের এড়িয়ে চলা এবং এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পেতে চাইলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

একটি সত্যবাদী প্রশংসা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রভুর সামনে নম্র, পবিত্র এবং সত্যই তাঁর প্রভুর প্রতি নিবেদিত, দুটি আলোর অধিকারী, আল্লাহর সর্বাধিক ভক্তিকারী, মহান, যিনি দু'টি নামাযের দিকে (কিবলা) প্রার্থনা করেছিলেন।), মক্কার পবিত্র ঘর এবং জেরুজালেমের সবচেয়ে দূরের মসজিদ। তিনি দুইবার হিজরত করার সৌভাগ্য ও আশীর্বাদ উপভোগ করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতের দুই চূড়ার মাঝখানে দোয়া করেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। তিনি নিয়মিত রাতে উঠতেন দীর্ঘ স্বেচ্ছায় প্রার্থনা করতে এবং তার প্রভুর সামনে নিজেকে সিজদা করতে। তিনি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাকে ইহকাল ও পরকালে আলিঙ্গন করেন এবং তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় পান। তিনি ছিলেন উদার এবং সবচেয়ে লাজুক এবং তিনি ছিলেন সজাগ, শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর প্রভুর ভয়শীল। দিনের বেলায় তার সৌভাগ্য ছিল চরিত্রের কল্যাণ, রোজা ও নামাজ এবং রাতে তার ভাগ্য ছিল স্বেচ্ছায় নামাজ, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, মনন ও প্রার্থনা। উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের মধ্যে ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 5 অধ্যায়ে আল মায়িদাহ, 93 নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন:

"...তারা আল্লাহকে ভয় করে, বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে, তারপর আল্লাহকে ভয় করে এবং বিশ্বাস করে, তারপর আল্লাহকে ভয় করে এবং ভালো কাজ করে; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

উপসংহার

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরকতময় জীবন অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি কার্যত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা এবং অনুসরণ করে তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার ইচ্ছার উপযোগী আদেশ বাছাই করেননি, বরং তিনি মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশকে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত ছিলেন। তাঁর একক লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ এই মহৎ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই মনোভাব তাকে আধ্যাত্মিকভাবে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এবং তিনি আধ্যাত্মিকভাবে পরকালের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এর জন্য কার্যত প্রস্তুতির জন্য তার প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে, মহানবী (সা.)-এর পর সর্বোত্তম দলে পরিণত করেছিল। ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া- তে এই সত্যটি আলোচনা করা হয়েছে । তাবাকাত আল আসফিয়া, বর্ণনা 278. তাই, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার মাধ্যমে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যাতে তারাও উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করে। .

উপরন্তু, তার জীবন অধ্যয়ন করলে, এটি স্পষ্ট যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সহজে পৌঁছেনি। সাহাবায়ে কেরামের রক্ত, অশ্রু, ঘাম এবং ত্যাগের মাধ্যমে তারা তাদের কাছে

পৌঁছেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত, এই সত্যটি আজ মুসলমানদের দ্বারা প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, কারণ ইসলামের শিক্ষাগুলি আজকাল খুব সহজলভ্য । কেউ কল্পনা করতে পারেন যে উসমান, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, কতটা হতাশ হবেন যদি তিনি দেখতে পান যে কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারে। নিঃসন্দেহে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের ত্যাগের জন্য তাদের পুরস্কার পাবেন কিন্তু মুসলমানদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তারা তাদের কাছে ঋণী। এই স্বীকৃতি কেবল কথায় নয় কর্মে দেখাতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শেখা ও আমল করা জড়িত। এটিই একমাত্র উপায় যা একজন সাহাবায়ে কেরামকে স্বীকৃতি, সম্মান এবং ভালবাসেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কাজ ছাড়া কথা ভালোবাসার চেয়ে ভন্ডামীর কাছাকাছি।

প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসুল (সঃ) এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাদের জীবন অধ্যয়ন করতে খুব ব্যস্ত বলে তাদের খুব কমই চেনেন। , অক্ষর এবং শিক্ষা. কীভাবে একজন সত্যিকারের মানুষকে ভালবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন তারা বিচারের দিন কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ তাদের জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষার উপর অধ্যয়ন এবং অভিনয়। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক

অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

সন্দেহ ও আকাঙ্ক্ষার পরীক্ষায় আত্মসমর্পণ করে বিদ্রোহীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শিখে এবং আমল করে এবং এর ফলে ঈমানের নিশ্চিততা লাভ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সঠিক পথে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের পথে অটল থাকবে। আশা করা যায় যে যারা আন্তরিকভাবে তাদের পথে চলে সে পরকালে তাদের সাথে শেষ হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

" আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারা উত্তম।"

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

সম্পূর্ণ অডিওবুক - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের (রাঃ) জীবনী:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1Vizm7rRKaK5Vk9IdVBnpLLolh0dhYG

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe